শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

১৩৩৫ সালে রেঙ্গুনে গৃহীত প্রতিকৃতি

অন্ধকার-দৃষ্টি

—:০:—

সেটা ঠিক ১৩৩৩ সাল, আষাঢ় মাস।

রেঙ্গুনের 'এম্, এম্, রেগুেরিয়া' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময়েই আমি টংগু-শহরে সেন্ট্ জোসেফ্স্ কন্ভেন্ট্' উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতীর কার্য্যে নিযুক্ত হই। যথাসময়ে তথায় গিয়া কর্ত্তব্য গ্রহন করিলাম। আমিই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ায়, বিদ্যালয়াবাসে আমার বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া বিদ্যালয়ের প্রধানা অধ্যাপিকা 'ভগিনী ইষ্টার' এবং তত্ত্বাবধায়িকা 'ভগিনী অগষ্টাইন' উভয়ে পরামর্শ করিয়া আমাকে উক্ত বিদ্যালয়ের সন্নিকটে একখানা বাড়ী ভাড়া করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। তদনুসারে একখানা দ্বিতল-বাড়ী ভাড়া করা হইল। একটি মাত্র বালক-ভৃত্য সঙ্গে আমি শুধু উপর তলাটাই নিজের ব্যবহারে লাগাইতাম। নিম্নতল একেবারে খালি রাখিয়াছিলাম।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড একটী বাগিচা-সংলগ্ন। পূবে সুন্দরভাবে বাঁধানো একটী ইঁদারা। দক্ষিণে প্রশস্ত রাজপথ। সম্মুখ ভাগে রাজপথের অপরধারে মৌলমেইনের তালাইং-জাতীয় এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি কোন বিলাতী ব্যবসায়ীর কাঠের কারবারে ১২০৲ বেতনে চাকরী করিতেন। তাঁহার গৃহিনী অত্যন্ত দয়াশীলা, ধর্ম্ম পরায়ণা এবং মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার সংসারে তিনটী কন্যা ও একটী

পুত্র। বর্ণে ও আকৃতিতে ইঁহারা ঠিক প্রাচীন আর্য্যজাতির মত। তাঁহার প্রথমা কন্যার বয়স প্রায় উনিশ, কুড়ি; দ্বিতীয়া কন্যার পনের ষোল, তৃতীয়ার আট দশ এবং ছেলেটীর বার চৌদ্দ বৎসর। ঐ বাড়ীর লোকেরা সকলেই আমার এই বাড়ীর ইঁদারায় স্নান-করা, কাপড়কাচা ইত্যাদি কার্য্য করিতেন। আমি সেই বাড়ীতে যাওয়ার দুইদিন পরে ঐ বাড়ীর গৃহিণী অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, অত্যন্ত স্নেহভরে আমাকে বলিলেন—মাষ্টারবাবু, তুমি নাকি আমাদের মেমসাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে নিযুক্তহইয়া আসিয়াছ?

আমি নম্রভাবে বলিলাম—হাঁ।

তিনি অত্যন্ত পুলকিতা হইয়া বলিলেন—আচ্ছা বাবা, বউমা কোথায়? তাঁকে নিয়ে আসনি কেন?

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি মিটি মিটি হাসিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—তোমার বুঝি এখনও বিয়ে হয় নি?

আমি তাঁহার সেই কথারও কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিতেই লাগিলাম।

আবার তিনি বলিলেন—তোমার মা-বাপ আছে?

আমি একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—বহুকালপূর্ব্বে তাঁহারা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বাবা, সংসার অনিত্য—কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচ্ছা বাবা, সেজন্য কোন দুঃখ নাই। নূতন জায়গায় এসে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তোমার মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হ'বে। সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা আমাদের ধর্ম্মের মুখ্যতম আদর্শ। আমরা সেই আদর্শ মানিয়া চলি। একটী বালক ভৃত্য নিয়া একলা ঘরে দিনকাটানো চলেনা, তুমি আমাদের বাড়ীতে যাইও।

আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়া সেই কষ্ট ভুলিতে চেষ্টা করিও। আমি তাহার এই কথারও কোন জবাব না দিয়া হাসিতে লাগিলাম।

তিনি স্বরে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, তুমি আমার বাড়ীতে যাতায়াত করিলে আমরা কিছু অন্যায় মনে করিব। তাহা কখনও মনে স্থান দিও না। আমরা অত সঙ্কীর্ণমনা নই। আমার ছেলেমেয়েরা যা—তুমিও তা। আমরা ত তোমাকে ভিন্ন ভাবিব না।

আমি এবারে হাসিয়া বলিলাম—মাসীমা, আপনি যে এই প্রবাসেও এতগুলি সান্ত্বনার কথা বলিয়া আমাকে আদর দেখাইতেছেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, কিন্তু বেশী মেশামেশি জিনিষটা প্রথম-থেকে বড় ভাল নয়।

তিনি বলিলেন—হয়ত প্রথম তোমার মনে একটু সন্দেহের উদয় হইতে পারে; কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিবে, তোমার সেই সন্দেহের কোন কারনই থাকিবে না। আমার বড় মেয়ে কুমারী 'মাথেইন্' শাস্ত্রালোচনা করিতে বড় ভালবাসে।

আমি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সংক্ষেপে বলিলাম—আপনার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম মাসীমা। এখনই আমাকে একবার ব্যানার্জ্জি বাবুর বাড়ীতে যাইতে হইবে। যখনই হৌক, যে কোন বিষয়ের জন্যই হৌক—আমি আপনাদিগের নিকট যাইব। আপনার এই সহৃদয়তার কথা আমার মনে থাকিবে।

* * * * *

পাঁচ সাতদিন পরে বৃষ্টিতে ভিজিয়া আমার সর্দ্দি কাশি হয়। দেহে সামান্য একটু উত্তাপও আসে। এই খবর পাইয়া 'ড-এ' (শীতলাদেবী)

বিকাল বেলা আসিয়া বলিলেন—তোমার কি অসুখ করিয়াছে, বাবা ?

আমি বলিলাম—তেমন বিশেষ কিছু নয়। পরশুদিন বর্ষাতি-জামা না নিয়ে যাওয়ায় ভিজিয়া গিয়াছিলাম; তাতেই একটু সর্দ্দি হইয়াছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—গা-হাত-পা কি ব্যথা করিতেছে ? দেহে কি উত্তাপ আসিয়াছে ?

আমি বলিলাম—সামান্য, বিশেষ কিছু নয়।

তিনি বলিলেন—আমি এখনই আমার ছেলে 'মংপেইন্'কে পাঠাইয়া দিতেছি—তোমার গা-হাত-পা টিপিয়া দিবার জন্য 'মেক্‌ক্যা'কে ডাকিয়া দিতে ।

যথাসময়ে 'মংপেইং ও মেক্‌ক্যা' আসিয়া পৌছিল।

'মেকক্যা' লোকটী অন্ধ।

এত উঁচু সিড়ি উঠিতেও তাহার কোন অসুবিধা হয় নাই। 'মংপেইন্' আমাকে বলিল—আপনি নীচে বিছানাটা পাতিয়া শুইয়া পড়ুন। এ' টিপিয়া আপনার অসুখ সারাইয়া দিবে।

তাই করিলাম। সে পা হইতে টিপিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ পায়ের তালু এবং বুড়া আঙ্গুল টিপিতে আরম্ভ করিয়া বলিল—মাষ্টার-মশাই, বাত এবং শ্লেষ্মা প্রকোপে আপনার রক্তবহা নাড়ীগুলি যেন একটু কড়্ কড়্ করিতেছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে, তা নয় কি ?

আমি বলিলাম—হাঁ, ঠিক্ তাই।

সে আমার সমস্ত দেহ ক্রমান্বয়ে টিপিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি 'মেক্‌ক্যা ?

সে বলিল—হাঁ, মাষ্টারমশাই।

'মেক্‌ক্যা' অর্থ পদ্মলোচন। এ' যেন একটা প্রহেলিকার মত

আমার মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম রেখেছিল কে?

সে বলিল—আমার মাতৃদেবীই আমার এই নাম রাখিয়াছিলেন।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এমন কি করিয়া হইল? অন্ধ ছেলে—নাম, পদ্মলোচন। মায়ের কাছে সন্তানের যেন কোন প্রভেদই নাই। যাহা হৌক, সে কথা আর বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি থাক কোথায়?

সে বলিল—আমি একজন চীনা ছুতারমিস্ত্রীর বাড়ীতে বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি। তাদের ঘরটা ছোট, দুই তিনটা ছেলেপুলে নিয়া তাহারা দুইজন, আর আমরা দুইজন। অসুবিধা বড় বেশী। কি করি, কোন মতে পড়িয়া আছি।

আমি বলিলাম—তোমার আর কে আছে?

সে বলিল—আমার বউ আছে।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম—তোমার বউ তা হ'লে বেশ দেখিতে শুনিতে পায়?

সে বলিল—না মাষ্টার মশাই, বেশ শুনিতে পায় বটে, কিন্তু দেখিতে পায় না। বউটীও আমার মত দুই চক্ষুহীনা—জন্মান্ধা। প্রায় দুই বৎসর হইল ছুতার মিস্ত্রীর স্ত্রী ঐ অন্ধ মেয়েটীকে আনিয়া আমার সঙ্গে সংসার পাতাইয়া দিয়াছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এই রহস্য মন্দ নয়। অন্ধের সঙ্গে অন্ধ মিলিয়া দুর্গম সংসার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে।

তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বউ কি করে?

সে বলিল—কি আর করিবে, দেখিতে ত পায়না, বসিয়া বসিয়া কোন মতে চারিটী রান্নাবান্না করে।

আমি বলিলাম—সে রান্নাবান্না করিতে পারে ?

সে বলিল—পারে বৈ কি !

আমি বলিলাম—বেশ ; আচ্ছা, তোমার বৌয়ের নাম কি ?

সে বলিল—"মেক্‌শেং" অর্থাৎ চক্ষুষ্মতী।

আমি বলিলাম—বেশ ভাল হইয়াছে। তুমি অন্ধ যুবক—তোমার নাম পদ্মলোচন ; আর সে অন্ধা যুবতী—তার নাম চক্ষুষ্মতী।

আমার মনে বড়ই কৌতূহল হইল, ভাবিলাম, দেখতে হ'বে অন্ধযুবক পদ্মলোচন আর অন্ধযুবতী চক্ষুষ্মতীর জীবন যাত্রার পরিণতি। এই বিষয়ে তাহার সঙ্গে আরও বিশেষ আলোচনা করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে 'ড-এ' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পদ্মলোচন আমার মেরুদণ্ডের এবং ঘাড়ের রগগুলি খুব সাবধানতার সহিত টিপিয়া দিতেছিল। আমি অনেকটা সুস্থবোধ করিতেছিলাম।

'ড-এ' বলিলেন—এই 'মেক্‌ক্যা' বেটা ভারী ওস্তাদ, টিপিয়াই শীঘ্র অসুখ সারাইয়া দিতে পারে।

তারপর 'মেক্‌ক্যা'কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—মাষ্টারবাবুর অসুখটা শীঘ্র সাঁরাইয়া দে।

আমি মনে মনে হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তারপর তিনি বলিলেন—প্রায় দুই বৎসর হইল এই অন্ধ ছেলেটার জন্য আর একজন অন্ধমেয়ে পাওয়া গিয়াছে। চীনাকুতারের বউটা এদেরকে একত্র করিয়া দিয়াছে।

আমি একটু হাস্য করিয়া বলিলাম—'মেক্‌ক্যা' এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে সে কথাই বলিতেছিল। তার বৌয়ের নাম নাকি 'মেক্‌শেং'।

বৃদ্ধা তখন বলিলেন—বাবা, তুমি তাদের একটা উপকার কর।

আমি বলিলাম—কি ?

তিনি বলিলেন—তোমার বাড়ীর নীচের তলাটা শুধু শুধু খালি পড়িয়া আছে। এই অন্ধ নিরাশ্রয় বেচারাকে এখানে একটু পড়িয়া থাকিবার স্থান দাও।

আমি বলিলাম—তাহারা নীচের তলায় পড়িয়া থাকিতে পারে, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু—

তিনি বলিলেন—কিন্তু কি ? কি অসুবিধা আমাকে বল।

আমি বলিলাম—এ বাড়ীটা যদি আমি সব সময় না রাখি, অন্য কোন বাড়ীতে যদি উঠিয়া যাই।

তিনি আমাকে জোর করিয়া বলিলেন—তুমি যাইবে কেন ? তোমার অসুবিধা কি ? আমরা কি তোমাকে যাইতে দিব ?

আমি মনে মনে ভাবিলাম, ব্যাপার মন্দ নয়।

প্রায় একঘণ্টা কাল সে আমার গা-হাত- পা টিপিয়াছিল, এবার ধুমপান করিবার জন্য একান্তে গিয়া বসিল। চুরুট ধরাইয়া টানিতে টানিতে বলিল—মাষ্টার মশাই, আপনি কি আমাদেরকে একটু আশ্রয় দেবেন ?

তাহার স্বরে এতই কাতরতা ছিল যে, আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না,—বলিলাম—আচ্ছা।

তারপর হইতে তাহারা আমার বাড়ীর নীচের তলার আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদের সঙ্গে ঘরকন্নার কিছু সরঞ্জাম।

ইহার কিছুদিন পরে সেই চীনা ছুতার মিস্ত্রীর বউটী তাহার বৃদ্ধ স্বামী চীনাটাকে সঙ্গে লইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল—মাষ্টার মশাই, আমাদেরকেও একটু স্থান দেবেন কি ? আমরা দুই তিন দিন মাত্র থাকিব। মনে মনে ভাবিলাম, আব্দার মন্দ নয়।

আমি কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম।

সে দুইবিন্দু অশ্রুপাত করিয়া আবার বলিল—আমরা বড় অসুবিধায় পড়িয়াছি। ওখান থেকে চলিয়া যাইব। দুই তিন দিন কোনমতে আমাদেরকে থাকিতে দিন।

ঐ নারীর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তখন বলিলাম, নিতান্ত যখন তোমাদের অসুবিধা বলিয়া বলিতেছ, তখন না হয় দুই তিন দিন এখানে থাকিতে পার।

তারপর দিন আমি বিদ্যালয়ে গেলে, তাহারা আসিয়া আমার বাড়ীর নিম্নতল অধিকার করিয়া বসিল। বিকাল বেলা বিদ্যালয়ের কার্য্যশেষে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে 'ড'-এ' আসিয়া আমার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমি নাকি খুব দয়ালু, খুব সহৃদয়, অত্যন্ত পরদুঃখকাতর। দুঃখীর দরদ বুঝিতে আমার মত নাকি কেউ নাই। কলিযুগে নাকি আমার মত লোক বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে কি 'ড-এ' আমার পেছনে আরও যে কতকগুলি বিশেষণ লাগাইতেন, তাহা জানি না। জোর করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিবার জন্য আমি বলিলাম—মাসীমা! কেন আঁনাকে লজ্জা দিতেছেন?

তিনি আবার বলিলেন—সত্যি করে বল্‌ছি বাবা, আমার ত আড়াই কুড়ি বৎসর বয়স হ'ল, কিন্তু তোমার মত এমন উদারচিত্ত যুবক আর ত দেখি নাই!

আমি নম্রভাবে বলিলাম—আমার ত কোন কৃতিত্ব নাই মাসীমা। এই সব ভগবানের দয়া—তাঁহার লীলা—তাঁহারই খেলা—তাঁহারই সৃষ্টি-প্রবেণী। তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই আশ্রয় দাতা, আমার ত কিছুই নাই।

তিনি এবার একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন—'কালাজাতিরা'

দেখিতেছি সকলেই ঈশ্বর মানে । এবার আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—ঈশ্বর-টিশ্বর কিছু নাই বাবা, সব কর্ম্মফল। সমস্তই পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। নিজেই নিজের কর্ত্তা—নিজেই নিজের স্রষ্টা—নিজেই নিজের বিধাতা। বাহিরে কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা নাই।

বুঝিলাম—তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। তখন নম্রভাবে বলিলাম—যা হোক মাসীমা, ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়া তর্ক করায় কোন ফল নাই, তার মীমাংসাও হয় না ; আমি কিন্তু আপনার উপদেশে "মেকৃক্যার" গা-হাত-পা টিপুনীতে বেশ সারিয়া গিয়াছি।

তারপর দিন হইতে 'ড-এ'র মেয়ে তিনটী প্রায় সময়েই আমার বাড়ীর নীচের তলায় বৃদ্ধ চীনার যুবতী ভার্য্যার সঙ্গে নানা গল্প গুজব করিতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বনিয়মে দিন কাটিতেছিল। বাড়ীর আশ পাশ চারিদিকে আমার সহৃদয়তার ও করুণার কথা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ছুতার-মিস্ত্রী চীনা বেচারা ও তাহার যুবতী ভার্য্যার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, তাহারাও এইস্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার মত চাপিয়া বসিয়াছে। আমিও আর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। চারিদিকে যখন লোকমুখে আমার প্রশংসার বাণী শুনিতে পাই, তখন তাহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিয়া আবার অপ্রশংসার ভাগী হইতে ইচ্ছা হইলনা।

কয়েক দিনের মধ্যে ছুতার মিস্ত্রীর যুবতী-ভার্য্যা আসন্নপ্রসবা বিধায় একটু অসুস্থ হইয়া পড়িল। 'ড-এ'র মুখে শুনিলাম, তাহার হাতে-পায়ে-মুখে শোথ আসিয়াছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, চিকিৎসা নাই, বেচারী বড়ই কষ্টে ছিল। আমি সেদিকে মোটেই ঘেঁসিতাম না।

সে দিন বৃহস্পতিবার সকালবেলা ১০ টার পর আমি বিছানায় শুইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিলাম। কাঠের খিলান বলিয়া নীচে কথা বলিলে উপরে শোনা যাইত। বৃদ্ধার জ্যেষ্ঠা কন্যা 'কুমারী থেইন্' এবং চীনার যুবতী-ভার্য্যা নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল। এ-রকম সময়ে আমার বাড়ীতে থাকার কথা নয়, সেই বিশ্বাসেই বোধ হয় 'কুমারীথেইন্' চীনা পত্নীকে বলিল—দিদি, আমাদের মাষ্টার মশাই বড় দয়ালু, খুব খরচ পত্রও করেন। বিদ্যালয়ের মেয়েদের মুখে শুনিতে পাই, তিনি নাকি খুব বিদ্বান্ লোক।

চীনা-পত্নী নিজের দেহের কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া হাসিয়া বলিল—মাষ্টারকে বুঝি তোর খুব মনে ধরেছে?

সে বলিল—দূর! তা' হ'বে কেন? তিনি বিবাহিত।

চীনার স্ত্রী বলিল—আমি বল্‌ছি শোন্, তিনি বিবাহিত নন্।

'কুমারী থেইন্' দৃঢ়স্বরে বলিল—তুই জানিস্ না দিদি। তিনি বিবাহিত না হইলে এই মেয়ে-বিদ্যালয়ে কাঁচাবয়সে কি করিয়াই বা শিক্ষকতা করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন?

চীনার স্ত্রী বলিল—আমি বাজি রাখিয়া বলিতেছি, তোর মাকে জিজ্ঞাসা করিস্ আমার কথা সত্য কিনা! তাঁহার বাহিরের হাবভাব, চালচলন দেখিয়া বুঝিতে পারিস্ না, বিবাহিত লোকেরা কি এত বেপরোয়া খরচ করিতে পারে? নাকি এমন দয়ালু হইয়া আমাদের মত অজানা- অচেনা লোককে নিজের বাড়ীতে স্থান দিতে পারে?

চীনা-পত্নীর যুক্তিটা 'কুমারী থেইন'এর অন্তরে খুব লাগিয়াছিল। তাই সে বলিল—তোর অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয় দিদি!

চীনা-পত্নী বলিল—আমি কি কখনও তোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিতে পারি? তোর নিজের রূপে যে-কোন পুরুষেরই অন্তর জয় করিতে

পারিবি। আমার মনে হয়—আর মনে হয় বলি কেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তুই একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে একেবারে নিজেরটি করিয়া নিতে পারিবি।

প্রথম হইতে তাদের ঐরূপ কথাবার্ত্তা আমার কানে যাওয়ায়, সব শুনিবার জন্য আমি একটু উৎকর্ণ হইলাম। বাস্তবিকই, পুরুষের অন্তর জয় করিবার মত রূপ ঐ তরুণীর অঙ্গে ছিল। কেশলক্ষণ, দন্তলক্ষণ, বর্ণসম্পদ, স্বরমাধুর্য্য, চলনভঙ্গিমা সবগুলিই তাহার অত্যন্ত সুশোভন ছিল। হস্তস্থিত পুস্তক রাখিয়া দিয়া ঔৎসুক্যভরে কাঠের খিলানের উপর কান পাতিয়া রাখিলাম।

চীনা পত্নী বলিল—তুই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখ্। তোর মাকে এখন কোন কথা বলিস্ না। আর না হয়, আমিই তোর জন্য কিছু ওকালতি করিব।

অন্ধের পত্নী অন্ধা—'মেক্শেন্' হঠাৎ বলিল—আমাদের মাষ্টার অত্যন্ত ভাল মানুষ। তিনি তোমার মত সুন্দরীকে দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন।

চীনা পত্নী বলিল—'কুমারী থেইন্' যে সুন্দরী, তাহার রূপে যে একজন বিদেশী, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত-যুবক আকৃষ্ট হইবেন, সেটা তুই কি করিয়া বুঝিলি?

অন্ধ-পত্নী বলিল—আমি চোখে দেখিতে পাইনা, বটে, কিন্তু শব্দ এবং গন্ধে আমি এসব বেশ অনুভব করিতে পারি।

যে সব মানব-মানবী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অকুশল কর্ম্মের ফলে চক্ষুরিন্দ্রিয় হারায়, তাদের অন্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি অধিকতর প্রবল হয়। আমি সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের রূপ ও গুণের কথা বলিতে পারি।

'কুমারী থেইন্' তাহাদের কথা শুনিয়া একটু হতাশভাবেই বলিল—আমার কি সেই সৌভাগ্য হইবে ?

'মেকৃশেন' বলিল—তুই আগে থেকেই নিরাশ হইতেছিস্ কেন ?

এবার সে যেন একটু বিরক্তির সুরেই বলিল—তুই ত অন্ধ। 'মংমেকৃক্যা' অন্ধ বলিয়াই তোকে বিবাহ করিয়াছে ; তাহা না হইলে অন্য কেহ কি তোকে নিয়া ঘর করিত ?

এবার শ্রীমতী চক্ষুমতীর আঁতে ঘা পড়িল, সেজন্য সেও বিরক্তি সুরেই বলিল—তুই ত জানিস্ না, আমাকে আরও কয়েক জন সম্পদশালী যুবক ভালবাসিয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল।

'কুমারী থেইন' এবার রীতিমত রাগ করিয়া বলিল—বাজে বকাবকি করিস্ কেন ? তোকে যদি কোন ভাল মানুষ বিবাহ করিতে চাহিত, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে ঘর-সংসার না করিয়া এই অন্ধের সঙ্গে ঘর সংসার করিতেছিস্ কেন ?

সে অবিচলিতকণ্ঠে বলিল—তোমরা কি সেকথা বুঝিবে ? দুইদিন বাদে হয়ত তাহারা আমার দেহ ভোগ করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইত এবং আবার একটী বিবাহ করিয়া বসিত। তারপর চিরকালই অন্ধা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আমাকে গলগ্রহ ভাবিত। আমি সেইজন্যই তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এ-অন্ধ আমাকে ছাড়িয়া পলাইবে না, পলাইবার তার উপায় নাই। আমাকে ঘৃণাও করিতে পারিবে না—তাহার সেই পথও বন্ধ। সেইজন্য ধনিপুত্র 'মংমেইন্' যখন আমাকে প্রেম নিবেদন করে, তখন আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। তোমাদের মত যাহারা চোখে দেখিতে পায়, তাহারা বলে আমার অঙ্গে নাকি রূপ আছে, দেহ-গঠনটাও নাকি সুন্দর, যৌবন-জোয়ারে বক্ষ ও উর্ব্বর—

'কুমারী থেইন্' তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—বাজে বকিস্নি আঁধি। আগে যাহা বল্‌ছিলি, তাই বল্। তোর নিজের কথা এখন রাখ্।

চীনা-পত্নী হাসিয়া বলিয়া উঠিল—দুঃখিনীকে কটুকথা বলিস্‌নে বোন্!

'কুমারী থেইন্' বলিল—তা নয়, কটু কথা বলিয়া তাহার মনে আঘাত দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। বাজে বকিতেছিল বলিয়া একটু সাবধান করিয়া দিলাম; বলিয়া সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কি একটা কাজের জন্য তাহার মাতা তাহাকে ডাকিতেছিলেন বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কেন জানিনা, আমি যেন আমার সম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। সে-আশা মিটাইতে না পারিয়া মনে বড় সুখ অনুভব করিতে পারিলাম না।

ছুটীর দিন বলিয়াই বেশ বেলা করিয়া স্নান করিতে নাবিলাম। আমার স্নান করিবার সময় 'কুমারী 'থেইন্' এবং তাহার ছোট ভগিনী চারি পাঁচখানি রুমাল এবং আট দশটা বালিশের আচ্ছাদনী লইয়া আসিয়া কূপের ধারে কাচিতে বসিয়া গেল। প্রকাশ্য দিনের বেলায় ফাঁকা জায়গায় এমন অসঙ্কোচে, অসীম সাহসে তাহারা এক বস্ত্রে বক্ষঃস্থল হইতে নিম্নভাগ আবৃত করিয়া স্নানরত আমার কাছে আসিয়া বসিতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। শুধু তাহা নয়, দড়িবাঁধা বাল্‌তীটি কূপে ফেলিয়া দিয়া জল তুলিয়া আমার পায়ের কাছে ঘেঁসিয়া রাখিয়া বলিল—আপনি আর একটু ওদিকে সরিয়া যান।

আশ্চর্য্যের উপর আরও আশ্চর্য্য হইলাম। ভদ্র গৃহস্বামী পুরুষকে প্রতিবেশী আগন্তুক যুবতী আসিয়া এমন অসঙ্কোচে যে তাড়াইয়া

দিতে পারে, সে পরিচয় আজ আমি নিজেই পাইলাম। কিসের মোহে বা কিসের ভয়ে জানিনা, আদেশ প্রাপ্তি মাত্রই আমি সরিয়া গেলাম। আমার মনে ভয় এবং লজ্জা দুইই আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচি। বলিতে কি, আমার বুকটা ও দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। তবে ভয়ে নয়, অনুরাগেও নয়—লজ্জায়। আমার বাড়ীর অনতিদূরে কয়েক জন ছাত্রী বাস করে। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে কেহ যদি দেখিতে পায়। ঐটাই ছিল আমার আশঙ্কার কারণ; অন্য-কিছু নয়। এমন কি, লজ্জায় আমি এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে, গায়ে মাথায় জল ঢালিয়া মৃক্ষিত সাবানগুলি রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলার সময় স্ত্রী-ঔত্তাপ্য-ধর্ম্মের প্রভাবে আমার দুপাটী দাঁত টক্ টক্ করিয়া উঠিল।

'কুমারী থেইন্' একটু হাসিয়া বলিল—আপনার বুঝি খুব ঠাণ্ডা লেগেছে ?

আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ছল-ছল করিয়া অপরাধীর মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তাহার কথার কোন জবাব দিতে পারিলাম না। আমি কিছু না বলিয়া স্নান সারিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াই চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় সে আবার বলিল—আজ কি আপনাদের ছুটী ?

আমি বলিলাম—হাঁ।

সে বলিল—আজ কিসের ছুটী ?

আমি বলিলাম—বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়া ভগিনীরা সকলেই রোমের —তাঁরা যে 'রোম্যান ক্যাথলিক'। রবিবার এবং বৃহস্পতিবার দুইটী দিনকেই তাঁহারা ধর্ম্ম সাধনের দিন বলিয়া মনে করেন।

সে বলিল—আমাদের উপোসথের মত বুঝি ?

আমি বলিলাম—হাঁ, তবে একটু তফাৎ আছে ; তোমাদের উপোসথ তিথি হিসাব করিয়া সপ্তাহে একদিন করিয়া পড়ে, কিন্তু ইহাদের সপ্তাহের দুইটী নির্দ্দিষ্ট দিন।

আমি গেঞ্জীটা পরিয়াছিলাম। আর এক পা বাড়াইয়াছি, এমন সময় সে বলিল—মাষ্টার মশাই, আপনাদের ভারী মজা।

আমি বলিলাম—সে কি ?

সে বলিল—কাজ কম করিতে হয়, কোন পরিশ্রম নাই, আর হরদম ছুটী। বেশ মজায় আছেন।

এতক্ষণে আমি মনে বেশ বল সংগ্রহ করিয়াছিলাম। স্ত্রী-ঔত্তাপ্য-ধর্ম্মের প্রভাব মুক্ত হইয়া বলিলাম:—তোমার বুঝি হিংসা হচ্ছে ?

সে বলিল—হচ্ছে বৈ কি ! হওয়ার কথা যে !

আমি বলিলাম—তাহা হইলে তুমিও কোন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করনা কেন ?

সে এবার বলিল--আমার যদি সেই যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে করিতাম বৈ কি !

এবার আমার মনে মস্ত বড় এক দুষ্টমী বুদ্ধি আসিল, যে জন্য আমি এখনও পর্য্যন্ত দুঃখিত অনুতপ্ত ও লজ্জিত আছি। হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, শিক্ষয়িত্রী হইবার যোগ্যতা না থাকিলে অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষক-স্ত্রী হইবার যোগ্যতাও কি তোমার নাই ?

একথা শুনিয়া সে নতমুখী হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিলাম তাহার গণ্ড হইতে কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। আমি ভয়ে পলায়ন করিলাম। সমস্তদিন একটা ভীতি, একটা উৎকণ্ঠা, একটা অস্বস্তি, একটা বিকৃতি মনের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। শনিবার দিন পর্য্যন্ত এভাবে কাটিল। মনের মধ্যে সেই খুঁৎ জমাট বাঁধিয়াই রহিল।

রবিবারদিন প্রচণ্ড অবসর। সকালবেলা চা পান করিয়া ষ্টেশনের ধারে বেড়াইতে গেলাম; ষ্টেশনের পূর্ব্বপাশে রেলকর্ম্মচারীদের বাসস্থান। ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষেরা স্বতন্ত্র আরামজনক বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক ছাত্রী ঐখান হইতেই আমাদের বিদ্যালয়ে আসিত। আমাকে দেখিতে পাইয়া 'কুমারী ডেনিস্' প্রাতরভিবাদন জানাইল। আমি খুশী হইয়া বলিলাম—তোমরা কি এই অঞ্চল থেকে যাও?

সে বলিল—আমাদের এখান থেকে অনেক মেয়ে যায়। এইটীই অমাদের বাড়ী, ভিতরে আসুন, আমার মাতা পিতার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিই।

দোতলা কাঠের বাড়ী। উপরের তলায় উঠিয়া বৈঠকখানায় আমাকে বসিতে বলিয়া মেয়েটী তাহার মাতাপিতাকে খবর দিতে গেল। তাঁহারা উভয়ে আসিয়া আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া আসন গ্রহণ করার পর "আমি আগে কোথায় ছিলাম. কতদিন এখানে আসিয়াছি" ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

রেল কর্ম্মচারীদের রবিবার সোমবার নাই। তখন বালিকার পিতা 'ডেনিস্ সাহেব' বলিলেন—'আপনারা বেশ অল্প খাটুনি খাটিয়া অধিক অবসর উপভোগ করিতে পারেন।' তাঁহার কথা শুনিয়া ডেনিস্ সাহেবের পত্নী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—তুমি অনধিকারচর্চ্চা করিতেছ কেন? শিক্ষকদের যাহা খাটুনি, সেই খাটুনি তোমাদের নাই! তোমাদের গৎবাঁধা কাজ,—পিয়ানো যন্ত্রের 'সা-রে-গা-মা'র মত সুর বাঁধা আছে; শুধু একটার পর একটা টিপিলেই আপনসুরে বাজিয়া উঠে। আর শিক্ষদের কাজ তা' নয়; নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া ছেলেমেয়েদের মনোবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া শিক্ষাদান করিতে

হয়; তাহাতে খাটুনি বেশী, মাথা গুলিয়া যায়। সেইজন্যই ত শিক্ষাবিভাগে এত বেশী অবসর। মস্তিষ্ক-চালনার কাজে বেশী অবসরের প্রয়োজন বলিয়াই শিক্ষাব্রতীদের অবসরও বেশী।

'ডেনিস্ সাহেব' তাঁহার পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—বিবাহের পূর্ব্বে তুমিও যে 'কন্‌ভেণ্ট'এর শিক্ষয়িত্রী ছিলে, সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তাঁহার আর অবসর নাই, এই অজুহাত দেখাইয়া তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিলাম।

তখন 'ডেনিস্ সাহেব' বলিলেন—আপনি উঠিতেছেন কেন? আমার কর্ত্তব্যের সময় হইয়াছে, আমি যাই। আপনি চা খাইয়া পরে যাইবেন। 'ডেনিস্ সাহেবের' পত্নীও সেই অনুরোধ করিলেন। আমি পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

'ডেনিস্-পত্নী' বলিলেন—আমার মেয়েটী ভাল পড়া বলিতে পারে ত?

আমি বলিলাম—ইংরেজীতে আর অঙ্কে বেশ ভাল; আর সবের কথা আমি বলিতে পারিনা। অন্য বিষয়েও খারাপ হইবে কেন? আপনার মত একজন বিদুষী, বিশেষতঃ ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে; সেই সন্তান কি লেখাপড়ায় ভাল না হইয়া পারে?

আমার এই কথায় তিনি যে খুব পুলকিতা হইয়াছেন, এবং গৌরবও অনুভব করিতেছেন, সে বিষয় তিনি প্রকাশ করিয়া কিছু না বলিলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া এবং ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া বেশ বুঝা গেল।

আজ কালকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়, নৈতিক চরিত্রের বিষয়, আধুনিক কালের আবহাওয়ার বিষয় ইত্যাদি করিয়া চা পান করিতে করিতে অনেক বিষয়ই আলোচিত হইল। তিনি আমাকে

খাঁটি বাঙালী বলিয়াও চিনিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, আমিও তাঁহাদের শ্রেণীর একজন। বেলা অধিক হইয়াছিল বলিয়া আমি উঠিলাম। তিনি আমাকে নীচের তলা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া সময় সময় এদিকে বেড়াইতে আসিলে তাঁহার বাড়ীতে উঠিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

বিকালবেলা চা পানের সময় 'ড-এ' আসিয়া বলিলেন—চীনার বউটাকে ঠিকমত চিকিৎসা করিতে না পারিলে হয়ত অকালে মারা যাইবে। গর্ভকালীন শোথ ভয়ানক বিশ্রী। এবার হয়ত তাহাকে রক্ষা করা যাইবে না।

আপাং শাকের ঝোল তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। মানকচুর মণ্ড ইত্যাদিও খাওয়াইয়া আশানুরূপ ফল না হওয়ায় হোমিওপ্যাথি মতে কোন ভাল ঔষধ আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ঔষধ তাহাকে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। সেইদিন সেই উপলক্ষ করিয়া 'ড-এ'র মেয়েরা সকলেই আমার বাড়ীর নীচের তলায় আসিয়া জমাট হইয়াছিল। আমিও বৃদ্ধার সঙ্গে চীনা-পত্নীকে দেখিবার জন্য নীচে নাবিয়া গেলাম। তখন তাহার প্রসববেদনা আরম্ভ হইয়াছিল। আমি তাহাকে দেখিতে গেলে সে 'কুমারী থেইন'এর কানে কানে বলিল, উঁাকে বল, একটা ভাল ধাত্রী ডাকিয়া দিতে। 'কুমারী থেইন' সেই কথাটা কি করিয়া আমাকে বলিবে ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। বিশেষতঃ আমার সেদিনকার চটুল রসিকতার কথাও তাহার স্মরণ ছিল, কাজেই সাহস করিয়া বলিবার পক্ষে তাহার বহু অন্তরায় ছিল। রোগিনীর অবস্থা দর্শনে সেই কথাটী আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তথাপি 'কুমারী থেইন'এর সেই সঙ্কোচভাবটাকে অপসৃত

করিবার জন্য বলিলাম—রোগিনী কি বলিতেছে, তাহা আমাকে বল।

সে একটু হাসিয়া সঙ্কোচের সহিত বলিল—আপনিই তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।

আমি বলিলাম তুমি কাছে আছ, সে তোমারই সঙ্গিনী; তোমার বলিতে কি হইয়াছে?

অপারিত পক্ষে এবার সে বলিল—একজন ধাত্রী ডাকিয়া দিবার অনুরোধ জানাইতেছে।

ধাত্রী-ডাকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি উপরে উঠিয়া আসিয়া একমাত্রা হোমিওপ্যাথি ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া আবার নাবিয়া গিয়া ঔষধটা 'কুমারী থেইন'এর হাতে প্রদান পূর্ব্বক বলিলাম—এখনই এই ঔষধটা তাহাকে খাওয়াইয়া দাও।

সে ঔষধটা হাতে লইয়া আমাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—অবস্থাটা কি রকম মনে হয়? রক্ষা পাবে ত?

আমি বলিলাম—সেজন্য ভাবনা নাই, নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া গেলে সব সারিয়া যাইবে।

সে এমন সরলভাবে আমার এত নিকটে আসিয়া সহজভাবে কথা বলিল যে, যাহা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতর লোকের কাছেই শুধু সম্ভব এবং শোভন হয়।

আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য মনে মনে কতই না আকাশ-কুসুম ভাবিতেছিলাম। সব বিধির বিধান; যাহা ঘটে, তাই ভাল; যাহা ঘটেনা, তাহাও ভাল। এও যে মঙ্গলময়ের মঙ্গলরাজ্যে সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ধারা।

তাহার পাশ হইতে সরিয়া যাইবার ইচ্ছা মোটেই আমার ছিল না; তথাপি সরিয়া যাইতে হইল। আমি বাড়ীর উপর উঠিয়া

গেলাম। যাহাই হৌক, ঔষধের সুফল দর্শনে আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং স্বীয় উপায়কুশলতার জন্য আত্মপ্রসাদও লাভ করিলাম। রাত্রি ৮টার সময় সে একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিল; প্রসূতি অত্যন্ত কাহিল। বৃদ্ধা নীচে ছিলেন। 'কুমারী থেইন' উপরে উঠিয়া আসিয়া আমাকে সেই খবর প্রদান করিল। আমি তাহাকে একান্তে পাইয়া বলিলাম—গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া করা, লোকের আপদে বিপদে রক্ষা করা, সাধ্যানুসারে সাহায্য করা খুব ভাল।

কি মনে করিয়া জানি না, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওসব বিষয়ে তোমার জুরি নাই মাষ্টার!

আমি হাসিয়া বলিলাম—আছে।

সে বলিল—কোথায় আছে? আমি ত দেখিতে পাই না।

আমি বলিলাম—দেখিতে চাও ত দেখিয়ে দি, এসো; বলিয়াই আসন হইতে উঠিয়া দর্পণ আনিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিয়া বলিলাম—এবার দেখিতে পাইতেছ?

সে হাসিয়া বলিল—দেখিতে পাইতেছি।

আমি বলিলাম—মুকুরে ত?

সে হাসিমাখা মুখে কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া বলিল—মুকুরে নয়, মুকুরের পশ্চাতে যে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেছি।

আমি বলিলাম—তোমার ভুল হইয়াছে, সেটা তোমার দৃষ্টিবিভ্রম। তোমার দৃষ্টিকে যদি অন্তর্মুখী কর, বিশুদ্ধ কর, তাহা হইলে নিজের রূপ নিজেই দেখিতে পাইবে। আচ্ছা এখন যাও, রোগী দেখগে। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিব।

সে নীচে নাবিয়া গেল। আগুন জ্বালিয়া প্রসূতিকে অনবরত দশদিন সেঁকার পর তাহার শোথ একেবারেই কমিয়া গেল।

আগে থেকে কিছুই জানা শোনা নাই, লক্ষণ দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারা যায় নাই অথচ চীনা-পত্নীর সন্তান জন্মের এক সপ্তাহ পরে রেষারেষির মত করিয়াই যেন অন্ধ-পত্নী অন্ধাও একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া বসিল।

কিছুদিন পরে আমি তাহাদিগকে দেখিবার জন্য নীচে গেলাম। চীনা-পত্নী আমাকে দেখিয়া শীর্ণমুখে মধুর হাসি মাখাইয়া আমার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিল।

আমি তাহাকে বলিলাম—তুমি কেমন আছ?

সে উৎফুল্লমনে জবাব দিল—আমি ভালই আছি; আপনার দয়ার কথা চিরকাল মনে থাকিবে।

আমি সলজ্জভাবে বলিলাম—আমার দয়ার কি আছে? আর আমিত এখানকার চিরস্থায়ী অধিবাসীও নই, কখন কোন্ দেশে চলিয়া যাই; তাহার কিছু ঠিক ঠিকানাই নাই।

সে একটু হতাশভাবে বলিল—কেন যাইবেন মাষ্টার মশাই? এ-শহরটা ভাল। এখানে কাজ করিতেছেন, এখানেই ঘর-সংসার পাতিয়া স্থায়ীভাবে বাস করুন।

আমি বলিলাম—সে কি কথা? আমার ত কোন নিশ্চয়তা নাই, হয়ত—

সে আমাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমি ঐ সব কথা শুনিব না। মনে করুন, আপনার ভগিনী যদি কোন রকম অনুরোধ-উপরোধ করে, সেটা কি আপনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন?

আমি বলিলাম—তোমার কথাটা আমার কাছে হেঁয়ালীর মত মনে হইতেছে; আমি তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

সে আবার বলিল—মনে করুন, আমি যদি এ জন্মে আপনার ভগিনী

হইতাম, তাহা হইলে আমি একটা আব্‌দার করিলে, সে আব্‌দার কি আপনি না রক্ষা করিয়া পারিতেন ?

আমি বলিলাম—তুমি আমাকে কি বলিতে চাও তাহা সোজাসুজি বলিয়া ফেল, ভূমিকার দরকার নাই।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল—আপনি মেয়েদের স্কুলে পড়ান। আপনার পক্ষে একাকী জীবন যাপন করা উচিত নয়।

আমি এবার একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিলাম—তা'তে তোমার কি ? তোমার নিজের সুখ-দুঃখের কথা বল, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝিবার চেষ্টা কর, নিজের কর্ত্তব্য নিজে করিয়া যাও। আমার জন্য তুমি ভাবিবে কেন ?

সে বলিল—আপনি রাগ করিতেছেন কেন ? 'কুমারী থেইন' রমনীরত্ন ; তাহাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া নিলে বেশ মানাইবে। আমরাও একটু দেখিয়া চোখ জুড়াইতে পারিব।

আমি এবার দৃঢ়স্বরে বলিলাম—তা'তে তোমার কি স্বার্থ ?

সে বলিল—আমার স্বার্থ এই যে, আমি একটা অখণ্ড-আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারিব। সেইটাই হইবে আমার পরম লাভ।

আমি আবার একটু রাগ করিয়া বলিলাম—সংসার করিতে যদি বংশ-বৃদ্ধি হয়, তার প্রত্যেকবারই জনক-জননী অল্পাধিক কষ্ট পাইয়া থাকে। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমারও চক্ষুস্থির হইয়াছিল। তুমি আজ আবার আমাকে সেই উপদেশ দিতেছ ?

সে বলিল—এ'কে কি কষ্ট বলে ?

আমি বলিলাম—কষ্ট নয়ত কি ?

সে বলিল—ইহা সৃষ্টির আনন্দ। জনয়িত্রীর সাময়িক যে কষ্ট দেখা

যায়, সেটা হইল আত্মদান করিয়া তাহার অন্তরের রূপকে ভিন্নভাবে বহিঃ প্রকাশের প্রয়াস মাত্র।

এবার আমি এই নারীর গভীর ভাবব্যঞ্জক কথায় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলাম—বাজে কথা বলিয়া তুমি আমায় বোকা সাজাইতেছ কেন? তোমার যদি অত গভীর জ্ঞান থাকে, তবে বিদেশী, বিজাতি, বিভাষী এক বৃদ্ধের গলগ্রহ হইয়াছ কেন? তোমার রূপ-যৌবনের ত বিশেষ অভাব ছিলনা। আমার মনে হয়, যোগ্য-জুড়িদার তুমি বাছিয়া নিতে পারিতে।

সে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরভাবে বলিল—এদেশের উচ্ছৃঙ্খল, অলস, ভোগানুরক্ত, বিলাসপ্রিয়, কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকদের বিষয় কি তুমি জাননা? তাহাদের মধ্যে প্রায় পনের আনা যুবকই প্রকৃত প্রেমের মর্ম্মগ্রহণ করিতে নারাজ। শুধু প্রেমের ভাণ করিয়া বাহির থেকে দেহভোগের আকাঙ্ক্ষাতে ভ্রমরের মত গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ধীর স্থির গম্ভীর তাহারা নয়, গরীবের দুঃখ ও বুঝেনা। ধনি-কন্যা হইলে রূপ-গুন না থাকিলেও তাহারা তাহার চারিধারে লোলুপ দৃষ্টিতে অর্থভোগের বাসনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সময় কাটায়। আবার কেহ কেহ ফাঁকি মারিয়া অর্থ আদায় করিয়া অবলার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, বাহিরে গিয়া বুক ফুলাইয়া কথাগুলি ঝাড়ে। আমাদের দেশে নানাদেশের নানাজাতীয় বিদেশী পুরুষ নানাকার্য্যের জন্য আসিয়া বাস করে। মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়েরা আমাদের দেশের মেয়েকে বেশীর ভাগ নিজেদের সঙ্গিনী করিয়া নেয়না। আর যদিও বা কেউ কেউ নেয়, তাহা হইলেও তাহারা কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু চীনারা কোন সময়েই পত্নীত্যাগ করেনা। তাহারা স্থিতিস্থাপক-শীল, গার্হস্থ্যধর্ম্মের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে উৎসাহ-

শীল। কুরূপা হোক, বা সুরূপা হোক, ধনী হোক বা নির্ধন হোক, যাহাকেই গ্রহণ করে, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। সেই হিসাবে এই চীনাজাতি আমাদের দেশাগত অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশী ভাল। তার উপর—

আমি বাধা দিয়া ববিলাম—আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আর বলিতে হইবে না।

সে সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল—তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাই বলিতেছিলাম, নচেৎ আমি কিছুই বলিতাম না। আচ্ছা, সে কথা থাক্, এখন বলি—তুমি আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবে কিনা বল।

আমি বলিলাম—তোমার ঐরূপ অনুরোধ রাখিতে পারিবার মত নয়।

সে বলিল—নয় কেন শুনি ?

আমি বলিলাম—তুমি এখন বিশেষ সুস্থ নও ; আমি ঐসব বিষয় আলোচনা করিয়া তোমার মাথা খারাপ করিতে চাই না—বলিয়াই উপরে উঠিয়া গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি যখন জানালারপাশে চেয়ারে বসিয়া চা-পান করিতেছিলাম, তখন আমার যাহাতে চোখ পড়ে, সে রকমভাবে বসিয়া 'কুমারী থেইন্' কি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। আমি সেইদিকে তাকাইলে সে নিবিষ্টমনে পুস্তকপড়ার ভাণ করিয়া যেন কত পড়িতেছে, সে রকমভাবে ঠোঁট দুইখানিও নাড়িতে থাকে ; আর আমি অন্যদিকে দৃষ্টিফিরাইলে সে আমার দিকে চাহিয়া থাকে। এইভাবটা অনেক্ষণ পর্য্যন্ত আমি চিন্তা করার পর বুঝিতে পারিলাম। ইহার পূর্ব্বেও ঠিক এমনি ধারা ভাব-ভঙ্গি অন্যত্রও দেখিয়াছি ; সুতরাং তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হইল না। স্ত্রীর রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই পঞ্চ-আরম্মন পুরুষের মনকে যেরূপ বিচলিত করে

পুরুষ-রূপ, পুরুষ-শব্দ, পুরুষ-গন্ধ, পুরুষ-রস ও পুরুষস্পর্শ প্রভৃতিও তদ্রূপ-ভাবে নারী-চিত্তকে বিচলিত করে। শুধু বিচলিত করা বলি কেন, প্রচণ্ড বিপ্লবের সৃষ্টি করে। জগতে তেমন অন্য কোন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ দেখাযায় না—যদ্দ্বারা ইহাকে উপমিত করা যাইতে পারে। যাহা হৌক্, এই প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্যে আমি যেমন বিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিলাম, সেও তেমনি বিপ্লাবিতা হইয়া গিয়াছিল। মনকে বিবেক-রজ্জুতে বাঁধিয়া, স্মৃতিরূপ আলম্বনে সংযোজিত করিয়া তাহার নশ্বরত্ব, অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলাম। হাজার চেষ্টা করিলেও সে-ভাব মনের মধ্যে স্থায়ী হইল না। পঞ্চারম্মনের দ্বিকূল-প্লাবী প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

কোন বিষয়েই হতাশ হওয়া, হাল ছাড়িয়া দেওয়া ভাবটা আমার স্বভাব নয়। প্রাণপণ বলে মনকে বাঁধিয়া কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। যথারীতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মতালিকা অনুসরন করিতে লাগিলাম।

রোমীয় ভগিনীদের নিকট জানিতে পারিলাম, সমস্ত ডিসেম্বর মাসটাই তাঁহারা পবিত্র মাস বলিয়া মনে করেন। সুতরাং নবেম্বর মাসে সব শ্রেণীর বার্ষিকপরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। ৩০শে নবেম্বর তারিখে একজন ভগিনী বলিলেন—তুমি এই ছুটীতে কোথায় যাইবে? আমি বলিলাম--খুব সম্ভব, রেঙ্গুন কিংবা মৌলমেইনে যাইব।

তখন তিনি বলিলেন—আচ্ছা, এই পবিত্র মাসের ৩২ দিন অবসরে তুমি কি আমাদিগকে স্মরণ করিবে না?

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—করিব ত নিশ্চয়ই,।

তিনি বলিলেন--আমারও সেই রকম মনে হইবে; বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তিনি একটু উদাসীন প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। বয়সও প্রায় পঁয়তাল্লিশ কি তারও একটু উর্দ্ধে। তিনি অসাধারণ বিদূষী ছিলেন এবং সব সময় দর্শনের জটিল-তত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া, মাথা ঘামাইয়া যোগাভ্যাস করিতেন বলিয়া অন্যান্য সকলেই বলাবলি করিতেন, তাঁহার একটু ছিটের ধাত আছে। আমারও সেরূপ মনে হইত। গভীর দর্শন শাস্ত্র চিন্তা করিতে গেলে ঔদাসীন্য আসে, জগতের প্রতি নিরাসক্ত চিত্ততার ভাব প্রসার লাভ করে। দর্শন-শাস্ত্রকে সকলেই নীরস বলিয়া বলেন, কিন্তু এই দার্শনিক-রমনী যেই উক্তি করিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে একটুও অসুবিধা হইল না। যাহা হৌক, যেদিন হইতে ছুটি আরম্ভ হইল, সেদিন বিকালবেলা বিদ্যালয় হইতে আসিবার পথে 'কুমারী-থেইন' বিদ্যালয়ের অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিল। আমার বাড়ীর দিকে যাইবার রাস্তার বাঁকেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল।

সে একটু ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিল—ছুটি হইল নাকি ?

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—হাঁ।

সে এই রকম সংক্ষিপ্ত কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিল—এবার ছুটিতে কি রেঙ্গুন যাইবেন ?

আমি বলিলাম—যাইতেও পারি।

সে বলিল—সত্য করিয়া বলুন।

আমি দৃষ্টি নিম্নদিকে সংবদ্ধ রাখিয়াই পথ চলিতে চলিতে বলিলাম—আমার কিছু ঠিক নাই, হয়ত মন্দালয়ও চলিয়া যাইতে পারি।

সে আবার বলিল—অত অব্যবস্থিত-চিত্ত হওয়া ভাল নয়। এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকিয়া মান, যশ, অর্থ, সম্পদ অর্জ্জন করিতে হয়।

আমি তাহার সেই কথার ও কোন উত্তর না দিয়া পথ চলিতেই

লাগিলাম। প্রকাশ্য রাজপথে সুস্পষ্ট দিবালোকে রূপবতী যুবতীর সাথে আলাপ করিতে আমাদের সংস্কারে বাধে বলিয়া, আমার মন স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। আমার বদন মণ্ডলও একটু বিবর্ণ হইয়াছিল। আমার সেই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া সে স্বরে উৎকণ্ঠা মাখাইয়া বলিল—আপনার কি ভয় কর্‌ছে?

তেমনি উদাসভাবেই আমি উত্তর করিলাম না।

সে বলিল—তবে কি অসুস্থতা বোধ করিতেছেন?

আমি পূর্ব্ববৎ বলিলাম—না।

এবার সে একটু ব্যাকুলভাবেই বলিল—নিশ্চয়ই আপনার কিছু হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়া বলুন কি হইয়াছে?

আমি তেমনি তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম—না, আমার কিছু হয় নাই। আমি বেশ আছি, বলিতে বলিতেই বাড়ীর দিকে না গিয়া ষ্টেশনের রাস্তা ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম।

তখন সে বলিল—আপনি ঐদিকে যাইতেছেন কোথায়? বাড়ী যাবেন না? কিছু খাবেন না?

আমি এবার স্পষ্ট করিয়াই বলিলাম—সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিব না; বাজারের রাস্তায় কোন খাবারের দোকানে ঢুকিয়া কিছু খাইব।

সে এবার শান্তভাবেই বলিল—বাড়ীতে যখন খাবার ব্যবস্থা আছে, তখন মিছামিছি বাজারের বাজে খাদ্যই বা খাইবেন কেন? আর আপনার এতই বা কি প্রয়োজন আছে, এমন সময় ছুটিয়া না গেলে যে চলে না?

আমি মিনতি স্বরে বলিলাম—তুমি আমায় মাপ কর; অত কথার জবাব এখন আমি দিতে পারিব না। তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, বলিয়াই ত্বরিতপদে চলিয়া গেলাম।

দশ পনের মিনিট এদিক সেদিক ঘুরিয়া বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম। আরাম-কেদারায় সর্ব্বাঙ্গ হেলাইয়া দিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ চীনার যুবতী-ভার্য্যা তাহার সদ্যোজাত সন্তানটীকে কোলে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার চিন্তাস্রোতে বাধা সৃষ্টি করিয়া সে বলিল—মাষ্টার, তুমি চোখ বুজিয়া ভাবিতেছ কি?

আমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, সে তাহার শিশুটীকে কোলে লইয়া স্তন্য-দান করিতেছে। তখন ভাবিলাম, আহা! গরীব মাতার ঘরে এই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুম-কোরকের মত শিশুটি! সে কোন্ অপরাধ করিয়াছিল? কেনই বা দুঃখিনীর ঘরে জন্ম নিয়াছে? এভাবের চিন্তা আমার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন চীনা-পত্নী একটি স্তনের বোঁটা ছাড়াইয়া অপর স্তন-বৃন্ত শিশুর মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া পরম স্নেহভরে শিশুর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিপাতিত করিয়া তাহার পূর্ব্বপ্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল। আমি সেই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া স্তন্য-পান-নিরত শিশুর মুখাবয়ব অবলোকন করিয়া বলিলাম—ধরাধামে কত মহাপুরুষ কত ভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁর বিচিত্র লীলা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। প্রেমের অবতার জগদগুরুগণের আবির্ভাব প্রায় এমনি করিয়াই ঘটে।

আমার এই উচ্ছ্বাস-প্রকাশে সে খল খল করিয়া হাসিয়া বলিল—তোমার ভাবপ্রবণ-হৃদয়ে বোধ হয় যীশুখ্রীষ্ট দেবের কথা উদয় হইয়াছে!

আমি বলিলাম—ঠিক তাই।

সে দুঃখিতভাবে গম্ভীর হইয়া বলিল—আহা! সেই সৌভাগ্য কি আমার মত দুঃখিনীর হইবে যে, বিশ্বপ্রেমিক—ক্ষমা-মৈত্রীর পূর্ণ অবতারকে বুকে ধরিয়া লালন পালন করিতে পারিব?

বুঝিলাম, আমার উচ্ছ্বাসের ধারা অপেক্ষাও তাহার উচ্ছ্বাসের ধারা উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তখন বলিলাম—ঠিক সেই কথা নয়, তবে আমার মনে হয়, যাহারা দুঃখী—যাহারা সন্তান সন্ততিকে সম্যকরূপে প্রতিপালনে অপারগ, তাহাদের পক্ষে সন্তান উৎপাদন করাও তত সুশোভন নয়।

সে একগাল হাসিয়া বলিল—ঐ কথা? কিন্তু ভাই, জন্ম-মৃত্যু জিনিষটা সাধারণ জীবের ইচ্ছাধীন নয়। যে জিনিষ আয়ত্তের বাহিরে, সে জিনিষের সম্বন্ধে জীবকে দোষারোপ করাও চলে না। আমি তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম—বাজে কথা বল কেন? জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এই যে সভ্যজগতে একটা ভীষণ আন্দোলন চলিয়াছে, তাহা কি তুমি জান না?

সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম, অপারগ, দুর্ব্বল, রুগ্ন, এবং অসংযত জীবের পক্ষে সন্তান উৎপাদন করা সংসারে আবর্জ্জনার সৃষ্টিকরা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সে হাস্য করিয়া ধীরভাবে বলিল—তোমাদের মত পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানীর পক্ষেই শুধু এই কথা খাটে।

এবার আমি অপমান বোধ করিলাম। সে বলিয়াই যাইতে লাগিল—তুমি যাহাই মনে কর না কেন, এ-সব বিষয়ে জীবের কোন অধিকার নাই। আভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অথবা সু-প্রজনন সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি এতই রহস্যাবৃত যে, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা কর্ম্মের অধীন—জন্মের অধীন। যে জন্মের অধীন, যাহার নিজের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নাই, সে পরের জন্ম রোধ করিবে কিরূপে? আর সন্তান-সন্ততির জন্মদান করা, নিজকে রূপায়িত করিয়া ফুটাইয়া

তোলা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ভিন্নভাবে বিকশিত হওয়ার লোভটা সৃষ্ট জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই লোভ নিবারণ করা দুঃসাধ্য। এবার বুঝেছ ভাই? ইহারই নাম, আত্মবিকাশ; ইহারই নাম পুনর্ভব. ইহারই নাম রূপান্তর বা জন্মান্তর।

সত্য কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার শিক্ষাভিমানী মন—সংস্কৃতির আলোপ্রাপ্ত মন—যার জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করিতাম সে-মন এক দরিদ্র গ্রাম্য-যুবতীর বিবেক-বিচার বুদ্ধির হাতে নির্ম্মমভাবে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইল।

আমি সলজ্জ ভাবে ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহাকে বলিলাম—দিদিমনি, আমরা যে জ্ঞান জিনিষটার জন্য এত অর্থব্যয়—এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষালাভের জন্য দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াই সে-সব তোমার কথায় একেবারেই অসার হইয়া যায়।

সে বলিল—কেন?

আমি বলিলাম—আমার যাহা শিক্ষা, আমার যাহা জ্ঞান, আমার যাহা ধারণা, সে সবের যে তুমি আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে। আমার মনে হয়, এই আধুনিক শিক্ষা তোমার মত নারীর গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ কথায় একেবারেই ভাসিয়া যাইবে।

সে হাসিয়া বলিল—তা যাইবে কেন ভাই?
এ-সকলও ত জ্ঞানের এক একটা দিক্, এক একটা ধারা, এক একটা বিকাশোন্মুখ শাখা, পল্লব, পত্র-পুষ্পের মত। খারাপ ত কিছুই নয়, অকিঞ্চিৎকর ও নয়।

আমি এবার খুব চিন্তাশীলের মত বলিলাম—হাঁ, দিদি, বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ডালপালা-পত্র-পুষ্প ইত্যাদি বিষয় নিয়া যেখানে ব্যস্ত, সেখানে তুমি মূলটি ধরিয়াই নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছ। আমরা

উন্মাদনার পশ্চাতেই ছুটিয়া চলিয়াছি ; বীরত্বের দাপটে, গবেষণার চমৎকারিত্বে ও মৌলিকত্বের দাবীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছি। আর তুমি—তোমরা, বেশ শান্তভাবে মূলকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসার যাত্রার পথে চলিয়াছ।

এতক্ষনে তাহার ক্রোড়স্থিত সন্তানটি স্তন্যপান করিতে করিতে পরম নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ছেলেটিকে জানুর উপর ভাল করিয়া শোয়াইয়া নিজের অঙ্গাবরণ সুসংযত করিয়া বলিল—পণ্ডিতি কথা, গবেষণার কথা, ভাব-বিহ্বলতা ইত্যাদি একটু কমাইয়া ফেল ; সরল সোজাভাবে সংসারের কর্ত্তব্যের পথ ধরিয়া চল। সংসারে সংসারী সাজ, নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর—যাহাতে জীবনের বিকাশ-প্রবাহ অব্যাহত থাকে। রূপ-গুণের ভাবধারা সঞ্জীবিত রাখিয়া নব নব রূপে তাহাকে রূপায়িত—লীলায়িত করিয়া বিকাশ করাই জীবের ধর্ম্ম এবং সেটা বজায় রাখাই কর্ত্তব্য। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চলে না, তা' শোভনীয়ও নয়। জাগতিক সমস্ত শৃঙ্খলার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যপথে চলিলেই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা হয়, অন্যথায় নহে। আর—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—দিদিমণি, তুমি বেশী বক্তৃতা করিয়া কি যে হেঁয়ালীর সৃষ্টি কর ; তাতে আমার পক্ষে যে তোমার আসল কথাটা বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

সে হাসিয়া বলিল—আমার মনে হয়, তুমি সব কথা বেশ বুঝিতে পার, সে-শক্তি তোমার আছে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্যই হোক্, কিংবা নূতন কিছু করার হুজুগের জন্যই হোক্, তুমি বোকা সাজিয়া বসিয়া আছ। এই বলিয়া সে 'মাথেইন্, মাথেইন্,' করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কি-কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে ভাবিয়া ভাববিহ্বলতায় আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। তাহার আহ্বানে 'কুমারী থেইন্' পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া মন্থরগতিতে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আমার ভাব-বিহ্বলতা ও তজ্জনিত দৈহিক অবসাদ অপসৃত হইল। আমি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলাম। চীনা-পত্নী 'কুমারী থেইন্'কে আদর করিয়া পাশে বসাইল। তারপর আমাকে বলিল—কোথায় যাইতেছ? একটু বোস।

আমি বলিলাম—না, আমার একটা দরকার আছে।

সে জোর করিয়া বলিল—সে দরকার পরে হইবে, আগে দু'টি কথা শোন!

আমি অনিচ্ছাসত্বেও আবার বসিয়া বলিলাম—তোমার কি বলিবার আছে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেল।

সে বলিল—তাড়াতাড়ির কথা কিছু নয়; তোমার এত তাগিদ কিসের? কাল্‌কে থেকেত একমাস ছুটি।

আমি মুরব্বিয়ানা করিয়া বলিলাম—তারপর?

সে বলিল—চুপ করিয়া বোস, ব্যস্ত হইওনা। আমি যাহা বলিতেছি শোন। শুধু ভাবে আপ্লুত হইয়া, হা হুতাশ করিয়া, তাহার স্রোতে ছুটিয়া বেড়াইলে কোন লাভ হইবে না বরং সেই ভাবগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া তাহাকে রূপদান করিবার চেষ্টা কর, চিন্ময় দিয়া মৃন্ময় সৃষ্টি কর।

এই নারীর গভীর জ্ঞানের কাছে আমার শিক্ষাভিমানী উদ্ধত মস্তক অবলুণ্ঠিত হইল। আমি অত্যন্ত ব্যথিতভাবে তাহাকে বলিলাম—তুমি এত গভীর জ্ঞান কি করিয়া লাভ করিলে, আর তাহা সঞ্জীবিত রাখার ধারা কি করিয়া প্রবাহিত কর, তাহাই আমি ভাবিয়া পাই না। তোমার কথা শুনিয়া

আমার বহুকাল বিস্মৃত দিদির কথা মনে পড়িতেছে। আহা! তাঁকেও যদি আজ কাছে পাইতাম, এই রকম আরও কত উপদেশ লাভ করিতে পারিতাম।

সে আদর করিয়া বলিল—সুস্থিরভাবে বসো; আমার কথা শোন, এই স্থানে ক্ষেত্র তৈরী করিয়া সযত্নে রক্ষা করিলে সকলকেই কাছে পাইবে, আনন্দে দিন কাটিবে। চঞ্চল মনের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে কোন লাভ হইবে না। এটা কি ওটা, হাঁ কি না, সত্য কি মিথ্যা, ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত—এসব বিষয় ভাবিতে গেলে ভাবনাই বাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে যাতনাও বাড়িয়া চলে; সুফল বড় হয় না। আমি বলি কি ঐসব ছেলে-মানুষি পরিত্যাগ কর, শান্ত-শিষ্ট, ধীরস্থির-গম্ভীর হও। আর একটা কথা বলি—বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নির্ম্মল জলেও রূপ প্রতিফলিত হইতে পারেনা, শুধু নির্ম্মল-স্থির জলেতেই রূপ প্রতিফলিত হয়। নানা-ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত মন রূপ দান করিতে অপারগ।

এই চীনা-পত্নী এত জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াও একটা বৃদ্ধ চীনা ছুতারকে যে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, সেজন্য আমার মন ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। 'কুমারী থেইন'এর অতুলনীয় দৈহিক-সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও এই গ্রাম্য-নারীর জ্ঞান-সৌন্দর্য্য আমার মন-মুকুরে অধিকতর প্রতিভাত হইল। আমি তাহাকে দুঃখ করিয়া বলিলাম—দিদি, তোমার সব কথা ভাল লাগে, সব আচরণই শোভন; কিন্তু ঐ বৃদ্ধ নিরীহ চীনা-ছুতারকে তোমার পাশে দেখিলে আমার মনে বড়ই পীড়া পাই। এই দুঃখটা আমার মন হইতে যাইবে না।

সে একটু হাসিয়া বলিল—তোমার সেই সব কথা এখন রাখ। সময়মত একদিন তোমাকে বুঝাইয়া দিব।

আমি বলিলাম—আগে যদি না বুঝাইয়া দাও এবং সেই বোঝানোটা যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে তোমার কোন কথাই আমি শুনিতে পারিবনা। এই বলিয়াই আমি জামা গায়ে দিয়া ছড়িহাতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শহরের উত্তর সীমানায় যেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে, সেদিকে বেড়াইতে গেলাম। জন বিরল জঙ্গলের মত জায়গা! প্রাকৃতিক মনোহারিত্ব থাকিলেও কৃত্রিম শোভা এবং লোকজন কম বলিয়া বেশীক্ষণ সেখানে থাকিতে পারিলাম না।

ঠিক সন্ধ্যার পরে যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথিপার্শ্বে তত্রত্য সাধারণ-কার্য্যবিভাগের বড় কেরাণী শৈলেন রায়ের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাকে পরম সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোড় করিয়া জলযোগ করাইয়া বলিলেন,—বানার্জ্জিবাবু, মজুমদারবাবু, সোমবাবু, মিত্রবাবু গুহবাবু, চৌধুরীবাবুদের মত আমিতো আর ওকালতি করিয়া বেশী টাকা রোজগার করিনা। আমি সামান্য ৪০০৲ টাকা বেতনের কেরাণী। তাঁরা আপনাকে যেমন অভ্যর্থনা করেন সে রকম আমি কিছুই করিতে পারিনা। কিছু মনে করবেন না।

আমি হাসিয়া বলিলাম—মিঃ রায়! আমাকে আর লজ্জা দিয়ে কাজ কি? এখানকার সব বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরাই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করেন এবং যোগ্য সম্মান দেন, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে বাহিরের খোলসটা বজায় না রাখিয়া আমি পারিনা। ভিন্নভাবে ও ভিন্ন চাল চলনেই আমাকে চলিতে হয়, নিজের সত্য পরিচয়টা দিয়ে মনের সত্যভাব প্রকাশ করিতে পারিনা।

রায়-বাবু খুব একচোট হাসিয়া বলিলেন,—কাজের খাতিরে

তা করবেন বই কি, আমরা তা জানি, আমাদের মধ্যে সে কথা নিয়ে আলোচনা হয়। সকলেই বলেন—কাজ নিয়েই কথা, তাতে কিছু এসে যায় না।

আমি উঠিতে চাহিলে তাঁহার বাড়ীর দুইটী চাকরকে লাঠি ও লণ্টন-হস্তে আমাকে শহরের পথ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

বিদেশে নিজের জাতভাইকে দেখিলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। রায়-বাবুর সেখানে যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল। শহরের রাস্তায় পৌঁছিয়া যষ্টি-ধারী হিন্দুস্থানী চাকর দুইটীকে বিদায় দেওয়ার পর মনে পূর্ব্ব-চিন্তা উদিত হইল; কিন্তু চিন্তা উদয় হওয়া আর বিলয় হওয়া ছাড়া তাহার অন্যকোন স্থায়ী সত্তা ছিল না।

রাত্রি ৯ টার পর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। 'ড-এ' এবং চীনা-পত্নী অমার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমি আসিয়া পৌঁছিলে, অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত একাকী বাহিরে ভ্রমণ করারজন্য, আমাকে দোষারোপ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—এদেশের হাল-চাল বড় ভাল নয়, অধিক-রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা আশঙ্কাজনক, কত রকমের আপদ-বিপদ হয়।

আমি বলিলাম—আপনাদের ভয় নাই, সে-সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আপনারা যে আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, বিদেশে আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এই বলিয়াই কাপড়-জামা ছাড়িয়া হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিলাম। তাঁহারা আমার অনতিদূরে বসিয়া রহিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলাম। তাঁহারা ধন্যবাদ জানাইয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমি ভোজন করিতেছি,

এমন সময় চীনা-পত্নী বলিল—তোমার কথা আমি 'ড-এ'কে বলিয়া দিয়াছি। এখন তুমি নিজে সে কথা বল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার কি কথা বলিয়া দিয়াছ?

সে বলিল—সেদিন তোমার সঙ্গে যে-বিষয়ে আমার বাদানুবাদ হইয়াছিল, সেই কথাটাই।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঐ সব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা একটু মোটা।

সে বলিল—ভাই, তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা করিতে পারিব না।

আমি বলিলাম—ঠাট্টার কথা কিছু নয়; যাহাতে আমি পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে পারি, সেভাবে কথাটা বলিবার জন্যই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া কোন কথা বলিতে যাওয়া কি বোকামি নয়?

এবার সে বলিল—আমাদের মাসিমা—ইনি খুব সহানুভূতিসম্পন্না এবং ধর্ম্মপরায়ণা। তাঁহাকে কোন কথা খোলাখুলিভাবে বলিতে দোষ নাই। 'কুমারী থেইন'এর কথা তাঁহাকে বল।

এই রকম ঘটনার সঙ্গে আমার যে আজ নূতন পরিচয় ঘটিতেছে তাহা নয়। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই, এ-সব বিষয়ে আমার জ্ঞানলাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আজ কেন জানি না, সঙ্কোচে, লজ্জায় আমি একেবারে নুইয়া পড়িলাম। কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর চীনা-পত্নী বলিল—তুমি কি কিছু বলিবে না?

তথাপি আমি নিরুত্তর।

সে আমার হৃদি-দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি কবে দু'চার জন লোক নিয়া 'ড-এ'র বাড়ীতে যাইবে?

এবার তাহার কথার অর্থ আমার কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই নারীরা একজন বিজাতি, বিদেশীর প্রতি এত শীঘ্র কেমন করিয়াই বা বিশ্বাসস্থাপন করিলেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

প্রকৃতির যা' লীলা, নারীরও তাই ; প্রকৃতি যেমন চির-রহস্যময়ী, নারীও তদ্রূপ। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে যেমন সাধনার প্রয়োজন, এবং সে যেমন একই কালে তাহার সমস্ত রহস্য সাধকের কাছে হঠাৎ বিবৃত করে না, নারীও তেমনি একই সময়ে সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করে না। তার রহস্যের পর রহস্য বাড়িয়াই চলে। তাহার অফুরন্ত রহস্য-ভাণ্ডারের গোপন চাবিকাঠি যে সাধক লাভ করিতে পারেন, তিনিই তদ্দ্বারা রহস্য-পুরের অন্তরতম দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকৃতির বাহিরে পৌঁছিয়া ভব-বন্ধন মুক্ত হন। আমি সাধক নহি, প্রেমিক নহি, রসিক নহি, মোহমুক্ত নহি, আসক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট এবং রহস্যের উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াই সেপথে চলিয়াছি, কোথায় গিয়া পৌঁছিব জানি না।

স্বাধীন-চিন্তায় এবং পরাধীন-জ্ঞানে যেখানে সংঘর্ষ বাধে, সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। তা'র প্রস্তাব আপাতমধুর হইলেও, তাহার মনোহারিত্বে মন-প্রাণ আকুল করিলেও, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিবেকের সাড়া লাভ করিলাম। অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে কেহ যেন বলিয়া উঠিল—কোন্ পথ?—জীবন পথে বিপদ-সঙ্কুল রথে চড়িয়া যাত্রা সুরু করা সুবিবেচনার কাজ নয়। শান্তিমার্গ অবলম্বন কর, আর্য্য-অষ্টযানে আরোহণ করিয়া মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা সুরু কর।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ছিল

যে, কোনরূপ মোহ, কোনরূপ বাধা, কোনরূপ কুটিলতা, কোনরূপ জটিলতাই যেন আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে না পারে।

আমি নম্রভাবে—বিনীত স্বরে বলিলাম—দিদি, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী, আর মাসিমা শীতলাদেবী আমার মাতৃস্বরূপা। তোমরা উভয়ে আমাকে মাপ কর। আজ আমার মনটা ভাল নাই, কোন গুরুতর বিষয় আলোচনা করার মত মনের অবস্থা আমার নয়। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

'ড-এ' গম্ভীর মুখে বলিলেন—আচ্ছা আমরা যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

আমি 'ড-এ'কে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলাম। চীনা-পত্নী নীচে নামিয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিয়া আবার আমার কাছে আসিয়া স্নেহ-মাখা-সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—তুমি বিশ্বাস করিতে পার না বুঝি?

আমি বলিলাম—কি?

সে বলিল—আমার কথা।

আমি বলিলাম—খুব বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি নাচার।

সে বলিল—কেন একথা বলিতেছ ভাই?

আমি বলিলাম—তোমার অবস্থা দেখিয়া, বোন!

এবার সে গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আরও কিছু বলিবার জন্য যখন সে আমার কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম—এতক্ষণ হয়ত তোমার ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তুমি নীচে যাও।

সে বলিল—তুমি এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে আমি মুখ রাখিতে পারিব না। আমি তাহাকে কথা দিয়াছি, যে কোন মতেই তোমাকে বুঝাইয়া——

এমন সময় সত্যসত্যই তাহার ছেলেটি ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে পাঠাইয়া দিলাম।

* * * * * * *

কেন জানি না, রেঙ্গুন কিংবা মৌলমেইনে যাওয়ার দিন ক্রমেই আমার পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

পাঁচ সাত দিন পরে অন্ধ-পত্নী একটি ছড়া গাহিয়া তাহার ছেলেটিকে দোলাইতেছিল। সেই ছড়াটি সাদা বাংলায় তরজমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

মিথিলার হ্রদ হ'তে সাধ ছিল বেঙ্ আনিতে,
চোখ দু'টী হ'বে তার হিরা-খণ্ড মত ;
বহুদিন ছিনু ব'সে সে-আশায় কত।
মিলায়েছে আজ বিধি, সে অমূল্য রত্ননিধি—
অভাগীর ঘরে ;
পরম পুলক পাই, হৃদে তা'রে ধ'রে।
ঘুমা রে বাছা মোর অন্ধের রতন !
নয়নের মণি তুই আশার স্বপন।

তাহার স্বর-মাধুর্য্য এত অধিক ছিল যে, সেই স্বরে মুগ্ধ না হইয়া কেহই থাকিতে পারিত না। জীবনে বহুস্থানে বহু অন্ধ দেখিয়াছি, প্রায় প্রত্যেকেরই শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং কণ্ঠ-স্বর অত্যন্ত মধুর। বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যে এই নিয়ম তান্ত্রিকতাটা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। একটী ইন্দ্রিয় সম্পদে যে বঞ্চিত, তাহাকে অন্যদিকের আর একটী ইন্দ্রিয়-সম্পদে অধিকতর যোগ্যতা না দিয়া বিধাতা যেন পারেন না। আমি এই অন্ধ-নারীর ঐরূপ গভীর ভাবের অভিব্যক্তিতে

এবং তাহার স্বর-মাধুর্য্যে বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া, মনোবৃত্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কায়িক অভিব্যক্তি কিরূপ হইতেছিল, তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিবার জন্য নীচে নাবিয়া গেলাম। অবিচলিত-কণ্ঠে, মনোময় সুরে তাহার ছড়া আমার কর্ণ-কুহর ভরিয়া দিতেছিল, সেই নিরবদ্য অনাড়ম্বর কলা-কৌশল-বর্জ্জিত সুর আমার অন্তরে এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রেরণা আনিয়া দিল। তাহাতে আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সজোরে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বেচারী অন্ধ-নারী অসহায়া সম্বলহীনা—মোটা সূতার তাঁতে-বোনা একখানা গায়ের কাপড় সমভাবে ভাজ করিয়া দুই প্রান্ত-কোটিকে দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ করতঃ কড়িকাঠে বাঁধিয়া সেই মোটা বস্ত্রের মধ্যখানে শিশুটীকে শায়িত করিয়াই দোলাইতেছিল। বেতের কিংবা কাঠের দোলা সংগ্রহ করার সামর্থ্য যে তাহার নাই। আমি মিনিট দু'য়েক নীরবে দাঁড়াইয়া তাহায় ছড়া এবং দৈহিক অভিব্যক্তির ভাবগ্রহণের চেষ্টা করিলাম।

শিশুটী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল, কাজে কাজেই তাহার গানও থামিল। আমি নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, তার পরে সে কি করে। দেখিলাম, দোলার পাশ হইতে সরিয়া উনানের পাশে গিয়া সে উনান জ্বালিল। তারপর অঞ্জলি ভরিয়া চাউল মাপিয়া হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া ধুইতে লাগিল। কলের পুতুলের মত সবকাজই সে সুনির্দ্দিষ্টভাবে করিয়া যাইতেছিল। ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া দিয়া তাহার ভাঁড়ার হইতে দুইটি বেগুন, একমুঠো তেঁতুলের কচিপাতা, সামান্য পরিমাণ শুকনো চিংড়িমাছ বাহির করিয়া লইয়া বেগুন দুইটি কুটিয়া একটা হাঁড়িতে সামান্য তেল, রসুন এবং পিঁয়াজ সংযুক্ত করিয়া পরিমাণমত জল দিয়া তৎসঙ্গে একটু 'ডাপি' গুলিয়া দিল। অন্য একটা হাঁড়ি টানিয়া

লইয়া তাহাতে কচি তেঁতুল পাতাগুলি একটু ধুইয়া কিছুপরিমাণ শুক্‌নো চিংড়ি মাছ, সামান্য কয়েক ফোঁটা তেল, সামান্য পরিমাণ 'ভাপি' তার সঙ্গে গুলিয়া দিয়া, চার পাঁচটী শুক্‌না লঙ্কা একটু জল দিয়া ভিজাইয়া লইয়া, হামামদিস্তার আকারে নির্ম্মিত একটা পুরু-মৃৎপাত্রে, মোটা একটা কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা লঙ্কাগুলিকে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ঐভাবে কুট্টিত লঙ্কাগুলি তাহার সাজানো ব্যঞ্জনে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখিল।

তখন আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—এইরূপ কচি-শিশুর পক্ষে কাপড়ের দোলা ঠিক নয়। আমি তোমার শিশুর জন্য একটি দোলা কিনিয়া দিব।

সে যেন কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হইয়াই বলিল—বেতের কিংবা কাঠের দোলনায় ত আমাদের দরকার নাই, আমাদের ঘরে ঐরূপ দোলা শোভা পাইবে না।

আমি বলিলাম—কেন?

সে বলিল—একটা চল্‌তি কথা আছে—

গরীবের গরিবানা,
নুন দিয়ে চিনিপানা।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—এ-ত তোমার অভিমানের কথা। আমি এতদিন তোমাদের দেখিতে আসি নাই বলিয়াই, বোধ হয় তুমি একথা বলিতেছ?

সে বলিল—ঠিক তা নয়!

আমি বলিলাম—তবে কি? আমি তোমার আর কোন কথা শুনিব না, এখনই দোলা কিনিয়া আনিব।

সে বলিল—তোমার যদি নিতান্ত সখ হয়, দোলা কিনিয়া আনিয়া রাখিয়া দাও।

আমি বলিলাম—তার মানে?

সে একটু হাসিয়া বলিল—তোমার খোকা হইলে সেই দোল্‌নায় তুল্‌তে পার্‌বে।

আমি বলিলাম—সে কি কথা?

সে বলিল—বেশ সোজা কথা।

আমি বলিলাম—তোমার এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ কি?

সে বলিল—স্বপ্ন দর্শনেই ত আমার অধিকার; বাস্তব দর্শনের অধিকার যে আমার নাই। তবে এ'টা ঠিক জানিয়া রাখিও, স্বপ্ন-রাজ্যের লোক স্বপ্নটাকেই বেশী ভাল বুঝে, বাস্তবটা তাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য এবং তাহাদের স্বপ্নদর্শন তেমন নিষ্ফলও হয় না।

আমি তাহাকে বলিলাম—তোমরা আমাকে কি ভাবিতেছ জানি না। আচ্ছা বলত, তোমরা আমার সঙ্গে এত রঙ্গ কর কেন?

সে বলিল—আমার ত অত রঙ্‌ নাই যে তোমার সঙ্গে রঙ্গ করিব?

আমি বলিলাম—তবে এ সব কি কর্‌চ?

সে বলিল—এ-ত রঙ্গ নয়, সঙ্গ—আসঙ্গ—সংযোগের সৃষ্টি, চিন্ময়ের মৃন্ময়াভিব্যক্তি।

আমি বলিলাম—তুমি এত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলে কিসে?

সে বলিল—বহির্দৃষ্টির বিনিময়ে।

আমি বলিলাম—একটা কথা বলি, সত্য করিয়া জবাব দিও। তুমি কি এই অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য বহির্দৃষ্টিটাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছ?

সে বলিল—অত কথার উত্তর তোমাকে আজ আমি দিতে পারিব না।

আমি বলিলাম—আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমার সম্বন্ধে যে একটা অশোভন ইঙ্গিত করিতেছ—

মাঝখানে বাধা দিয়াই সে বলিল—তুমি অশোভন ইঙ্গিত অর্থে 'কুমারী থেইন'এর সঙ্গে তোমার সংযোগ কল্পনাটা বুঝাতে চাও ত?

আমি বলিলাম—হাঁ, তা'ত বটেই!

সে বলিল—তাহা অশোভন নয়। তোমার যে বেয়াড়া খাপছাড়া ভাব—জীবনের ছন্নছাড়া গতি, এটাই হ'ল অশোভন।

আমি বলিলাম—সেটা আবার কি?

সে বলিল—তাহা জান না? তুমি বিদ্রোহী সাজিতেছ।

আমি বলিলাম—কাহার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করিতেছি?

সে বলিল—কেন, এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে—এই নারীর বিরুদ্ধে!

আমি বলিলাম—না, তা' নয়, মায়ার বিরুদ্ধে—মোহের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে ত আমার কোন নালিশ নাই।

সে বলিল—আহা, তুমি বুঝ না; যে প্রকৃতি—নারী—সাধনা ক'রে, কল্পনা ক'রে, কত কষ্ট ক'রে মনোমত একটা রূপ-গুণের সৃষ্টি করিল—নিজেরই সন্তোষ বিধানের জন্যে এবং আত্মতৃপ্তির অনুরোধে, সেই সাধনার ধন, সেই কল্পনার বস্তু, সেই অন্ধের নয়ন, অভাগীর ধন যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার অন্তরে কি রকম ব্যথাটা লাগে বলত?

আমি বলিলাম—তুমি এসব কি বলিতেছ?

সে বলিল—এই নারীর—প্রকৃতির সাধনার ফল—কামনার বস্তুই ত পুরুষ? পরা ছিল অপরা, সে ছিল একাকী। মনে হইল বড়

ফাঁকা; কারণ. একা হইলেই ফাঁকা–চঞ্চল—অস্থির। তখন সে দু'য়ের কামনা করিল, সেজন্য সাধনাও করিল; কারণ দু'য়ে স্থির। স্থিতি-ভাবের জন্যই তাহার এই প্রয়াস এবং তাহাতেই হইল পুরুষত্বের বিকাশ।

মূল উৎসকে অগ্রাহ্য করিয়া উৎসারিত বস্তু বাহবা পাইতে চায়, তা'কে ভাবে বন্ধন—তা'কে ভাবে পাপ, এই জন্যই ত বিশ্ব দাঁড়িয়ে গেল কপটতার প্রতীক হ'য়ে–যেন মস্ত বড় এক অভিশাপ।

আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলাম–তুমি এখন থাম। আমার একটু বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে—বলিয়াই নিজের ঘরে উঠিয়া আসিয়া, আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

আমার মন শৈশবকাল হইতেই নারীর প্রতি বিদ্রোহ করিয়া আসিতেছিল। নারী যে পরা—প্রকৃতি—আদ্যাশক্তি—জননী–ভগিনী, সেভাবে কখনও নিজের বিবেকের সঙ্গে চিন্তা করিয়া দেখি নাই। সোনার ব্রহ্মরাজ্যে আসিয়া অবধি স্ত্রী-স্বাধীনদেশের নারীদের অবাধ গতি এবং অসঙ্কোচে নানাজাতীয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেখিয়া মনে বিতৃষ্ণার ভাব প্রবল হইতে প্রবলাকার ধারণ করিতে-ছিল। ইহার পূর্ব্বে বহুক্ষেত্রে বহু নারীকেই আমি অবমানিত করিয়াছি। এবার একটু সহানুভূতির চক্ষে সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাহার মূল উৎস বিষয়ে অবহিত হইতে সঙ্কল্প করিলাম। বিষয়টাকে বহুবার বহুভাবে চিন্তা করিয়া কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট পথে জীবনধারাকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যতই সে বিষয় ভাবিতে লাগিলাম ততই দ্বৈত-ভাবধারা মনোমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

সৃষ্টির আকর্ষণে সৃষ্ট-জীব যখন আকৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখা দায়। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ যেমন আকৃষ্ট

হয়, এ-ও ঠিক তদ্রূপ। ইহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব কি করিয়া?

মনে চিন্তার ধারা যতই নানাভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, ততই যেন মনের খাপছাড়া ভাব স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতে লাগিল। সিদ্ধান্ত করিলাম, আগামী কল্য নিশ্চয়ই কোনদিকে বাহিরে যাইব। সেজন্য আমি বিকালবেলা জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতেছিলাম। বৈকাল ৫ টার সময় একজন মহিলা—যেন বহু-দিনের পরিচিতার মতন হাসিতে হাসিতে 'মাষ্টার মশায়, মাষ্টার মশায়' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটী দশ বার বৎসরের আর একটী আট দশ বৎসরের ছেলে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর উপর উঠিয়া আসিলেন। আমি তাহাকে ভদ্রতা সহকারে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া তাঁহার কি প্রয়োজন, তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন, তাঁহার নাম কি?—ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি হাসিতে হাসিতেই বলিলেন —আমার নাম : শ্রীমতী 'ফোয়াশেং'। আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আপনি যে-'ডনিন্'এর দোকানে কাপড়-চোপড় কিনেন, তিনি আমার মাসিমা। আমি আপনার নিকট আসিয়াছি—একটা বিশেষ প্রয়োজনে। আগে আমরা 'থানাটপিন্'-মহকুমায় ছিলাম। সম্প্রতি আট দশ দিন হইল, আমরা এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছি। আসিয়া অবধি 'ড-নিন্' এর বাড়ীতেই কোন মতে কষ্ট করিয়া রহিয়াছি।

'ডনিন্' আমাকে বলিয়াছেন, আপনার বাড়ীটা খুব বড়, সবটা নিজের ব্যবহারে লাগে না। আমাদেরকে অর্দ্ধেক দিন, আমরাও ভাগের ভাগ ভাড়া দিব।

আমি তাহার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ কি রকম ব্যাপার ?

মহিলাটীর বয়স চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হইয়াছিল। দোহারা চেহারা, বেশ মোটা-সোটা ; প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণ তাঁহার সমস্ত অঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার ছেলে দুইটীর চেহারা ঠিক মাদ্রাজীর মত। তিনি আবার ছয় সাত মাসের গর্ভবতী। বুঝিলাম, কোন মাদ্রাজীর সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

তিনি আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—আপনি যে কোন জবাব দিতেছেন না ?

আমি বলিলাম—আপনাকে কি জবাব আমি দিব ? আমার বাড়ীর নীচের তলায় দুইটী পরিবার বাস করিতেছে। এই উপরের তলায় আমার বেশ একটু আরাম লাগে। আমি ত আপনাদের জন্য স্থান করিতে পারিব না। বিশেষতঃ আপনারা যখন বাড়ীভাড়া দিতে সক্ষম, তখন অন্যত্র যেখানে সেখানেই বাড়ী পাইবেন।

সে আবার একগাল হাসিয়া বলিল—উপরের তলায় দুইটি পরিবার স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। আমাদেরকে স্থান দিতেই হইবে।

আমি বলিলাম—আমি একাকী, ছেলেটাকে নিয়া থাকি। আপনার ছেলে দুইটী নিয়া আপনারা দুইজন এখানে আসিয়া থাকিবার মত সুবিধা আমি করিতে পারিব না। আপনারা অন্যত্র বাড়ী খুঁজিয়া দেখুন। আর আমিও আগামীকল্য একটু বাহিরে যাইব ঠিক করিয়াছি।

তিনি বলিলেন—কোথায় যাইতে চান ?

আমি বলিলাম—খুব সম্ভব, মৌলমেইনে যাইব।

তিনি বলিলেন—বড় বড় শহরে বেড়ানো অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ে বেড়ানোই ভাল। যদি নেহাৎ বেড়াইতেই যাইতে হয়, তবে আমার সঙ্গে চলুন, আমাদের গ্রামে যাইব।

মনে করিলাম, এই প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তারপর বলিলাম—কাল্‌কের মধ্যে যে কোথাও আমি যাবই।

তিনি বলিলেন—চলুন, আমিও কালকেই যাইতে পারিব।

আমি বলিলাম—আপনি কখন যাইতে পারিবেন?

তিনি বলিলেন—কাল প্রাতে ৯ টার সময়।

আমি খুসী হইয়া বলিলাম—কি করিয়া যাইতে হইবে?

তিনি বলিলেন—এখানকার বড়বাজার হইতে মটরবাস 'থানাট্‌পিন্‌' পর্য্যন্ত যায়। তারপর নৌকোতে নদী পার হইয়া আবার মটরবাসে করিয়া আমাদের গ্রামে গিয়া বেলা ১২টা, ১টার মধ্যে পৌঁছিতে পারিব।

তিনি যে যাইবেন, সেটা আমি খুব বেশী বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তথাপি বলিলাম—আচ্ছা, আমার মনে থাকিবে।

তারপরদিন সকালবেলা ঠিক সময়ে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্বামীও আসিয়াছেন। তাঁহার স্বামী লুঙ্গি-পরা, মাথায় পাগ্‌ড়ি-বাঁধা—পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক খাঁটী বর্ম্মার মত।

তিনি আমাকে বলিলেন—আমার মাস্‌তুত-ভগিনী আপনাদের বিদ্যালয়ে পড়ে। তাহার মুখে আপনার অনেক কথা শুনিয়াছি। আপনি আমার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া বেড়াইয়া আসুন। তাঁহারা সেখানকার বেশ বড়লোক। যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন অন্য-বিষয়ে আলাপ করিব। আমার কাছারির সময় হইয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া ছেলে দুইটি সহ তাঁহার স্ত্রীকে আমার কাছে রাখিয়া গেলেন। বুঝিলাম, ইহার পিতা মাদ্রাজী আর মাতা বর্ম্মী। তিনি তাঁহার পিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া মাতার বৈশিষ্ট্য ও মাতৃ-পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর আমি মাতৃ-পিতৃ উভয় বৈশিষ্ট্যই ছদ্ম আবরণের আড়ালে রাখিয়া দিয়াছি।

যাহা হৌক, শ্রীমতী 'কোয়াশেন'এর তাড়াহুড়াতে শীঘ্রই বাড়ীর বাহির হইলাম। তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ী ধরিলাম। আর দুই মিনিট পরে গেলে গাড়ী পাওয়া যাইত না।

এদেশের নারীরা খুব সময়ানুবর্ত্তিনী, নিরলসা এবং ক্ষিপ্রকারিণী। মটরবাসে দেড়ঘণ্টা গিয়া 'থানাট পিনে' পৌঁছা গেল। সেখান হইতে নদী পার হইতে হইবে। গাড়ী হইতে নামিয়াই আমরা অন্যান্য খাদ্য সহযোগে চা পান করিলাম।

তারপর খেয়াঘাট পার হইয়া আবার মোটরবাসে উঠিলাম। দুই মাইল গ্রাম্য-পথ চলিয়া ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া বিস্তর ধূলা উড়াইতে উড়াইতে মটরবাস বায়ুবেগে ছুটিল। স্থান বন্ধুর বলিয়া গাড়ীর ঝাঁকানিও অত্যন্ত বেশী লাগিতেছিল। ঐ বেচারীর দুঃখে আমিও মনে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। ছয় সাত মাসের অন্তর্ব্বত্নী নারীর এমন ঝাঁকানিতে কি অবস্থা হইবে, হয়ত বা মরিয়াই যাইবে—এই ভাবনায় আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল।

ধূলা বালিতে অন্ধ হইয়া আমরা ১২টা ১ টার স্থলে বৈকাল ৪টার সময় 'জায়াট্‌জি' গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। মটরবাস তাঁহার পিতৃ-গৃহের সাম্‌নে গিয়াই দাঁড়াইল।

তাঁহার পিতা সেখানকার মোড়ল। মস্তবড় বাড়ী। বুড়াবুড়ী দুইজনেই ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে আগু বাড়াইয়া নিলেন।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' তাঁহাদের একমাত্র কন্যা। তাঁহাদের কন্যার মুখে আমার পরিচয় লাভ করিয়া অত্যন্ত সমাদরে উপরের তলায় একটা সুন্দর প্রকোষ্ঠে আমার স্থান করিয়া দিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে সেই বৃদ্ধার বোনের এক মেয়ে ছিল—নাম 'মাটেন্‌এুন্'। সে বেশ রান্নাবান্না করিয়া আমাদের খাওয়াইল।

পরদিন বিকালবেলা চা-পানের পর বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—"বাবা! তুমি আমার ঘোড়াটি নিয়া বেড়াইয়া আসিতে পার।" এই বলিয়া তাঁহার সহিস্‌কে ঘোড়ার জিন্ বাঁধিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন।

সে ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া আমাকে খবর দিল। আমি অপরিচিত বলিয়া ঘোড়া প্রথমে আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে স্বীকার করে নাই; কিন্তু তবুও আমি তাহর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। ঘোড়া বোধ হয়, রাগ করিয়াই তীরবেগে ছুটিয়া দুই তিনটা গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়া আমাকে নিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। ঘোড়াকে কোন মতে বাগে আনিতে পারা গেল না। একটা গাছের বড় ডালের নীচ দিয়া ঘোড়া অগ্রসর হইতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দুইহাতে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিলাম। ঘোড়া ছুটিয়া পলাইল; আমি গাছের ডালে ঝুলিতে লাগিলাম। বৃক্ষ-ডাল মাটি হইতে পাঁচ ছয় হাতের বেশী উঁচ্ ছিল না। গাছের ডাল ছাড়িয়া দিয়া আমি মাটিতে পড়িলাম। কোন্ পথে যাইতে হইবে, কোথা হইতে আসিয়াছি কিছুই জানি না। কাতর হইয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া রহিলাম।

সূর্য্য প্রায় অস্ত গমনোন্মুখ। তাহার সুবর্ণ-রশ্মিমালা বৃক্ষরাজিতে

পতিত হইয়া সোণালি রঙ্ ধারণ করিল। বন্য পক্ষীর কূজন-ধ্বনিতে আমার কান মুখরিয়া উঠিল, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া ফিরিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমার মনে হইল যেন আমি গ্রামের বিপরীতদিকেই চলিয়া যাইতেছি। তখন আবার ফিরিয়া সেই বৃক্ষতলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দিক্ নির্ণয় করার পর পশ্চিম মুখো হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমার পেছনদিকে ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আবার থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়া বায়ুবেগে আমার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছিল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া চাবুক তুলিয়া দেখাইলে ঘোড়া সেখানে থামিয়া আস্তে আস্তে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি লাগাম ধরিলাম। তখন ঘোড়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; অভিপ্রায়—সে আমার বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া আদর করিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। মন্থরগতিতে সে আমাকে লইয়া চলিল। কতদূরে যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। বনাপথ ছাড়াইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে চলিতে চলিতে গ্রাম্য-পথে আসিয়া দ্রুতবেগে তাহার প্রভুর গৃহাভিমুখে ছুটিল।

চারিদিক অন্ধকার। পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পর গ্রামের বাহিরে সাধারণতঃ লোকেরা থাকে না। আমার পিপাসা হইয়াছিল; কিন্তু জলপান করিবার উপায় ছিল না। ঘোড়া তাহার প্রভুর বাড়ীর সীমার মধ্যে আস্তাবলের নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা এতক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত সময় কাটাইয়াছেন। বৃদ্ধের নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল, আমার মত নূতন আরোহীকে কোন

জায়গায় ফেলিয়া দিয়া হয়ত বা ঘোড়া ছুটিয়া পলাইয়া আসিবে; কিন্তু আমাকে লইয়াই ঘোড়া ফিরিয়া আসাতে তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আমি জলপান করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহারা আমাকে একঘটী জল আনাইয়া দিলেন।

সমস্ত জল নিঃশেষে পান করিয়া আমি হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধ আদর করিয়া বলিলেন—ভয়ানক বেয়াড়া ঘোড়া; আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও মানিতে চায় না। তোমাকে যে রাস্তায় ফেলিয়া দেয় নাই, সেটাই পরম সৌভাগ্য।

আমি বলিলাম—আমিও ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু কি ভাবিয়া জানিনা, ঘোড়া নিজের ইচ্ছায় আমাকে আবার তুলিয়া লইয়া আসিয়াছে।

ভোজ্যদ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত ছিল। মুখ, হাত, পা ধুইয়া আসিয়া তাঁহারা আমাকে ভোজন করিতে বলিলেন। ভোজনশেষে ধর্ম্মবিষয়ক অনেক আলোচনা চলিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় এমন নির্ম্মল ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। বৌদ্ধদের মধ্যেও বর্ম্মা-বৌদ্ধদের মত সত্যপথের অনুসরণ আর কেহ করেনা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা অনেকেই বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের সার, মূলতত্ত্ব পরমার্থভাবে অন্য কোনদেশীয় বৌদ্ধরা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

আমিও বুদ্ধিমানের মত সব কথায় সায় দিয়া গেলাম। মোটরবাসের ঝাঁকানিতে এবং ঘোড়ার উৎপাতে দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাঁহারা আমার ক্লান্তি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—তোমার বিছানা প্রস্তুত, বাড়ীর উপরে গিয়া শুইয়া পড়।

আলো লইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া চলিল—বৃদ্ধার বোনের মেয়ে কুমারী 'টেন্‌গ্রুন্'। এই যুবতীই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন। বাড়ীর সব কাজই সে করে। তাহার বয়সও প্রায় সতের আঠার। সর্ব্ববিষয়েই সে আলস্যবিহীনা : মাতাপিতার মতো সে তাহার মাসিমা এবং মেসোমশাইয়ের সন্তোষবিধান করে। বেশ সরল সাদাসিদা, কথাবার্ত্তায়ও অত্যন্ত নম্র। গমন এবং কথাবার্ত্তা বলিবার সময় যৌবনের উন্মাদনার সমস্ত লক্ষণই অত্যধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়।

বেশ একটা ছোট গোল-চৌকির উপর পানপাত্রে জল রাখিয়া খাটের পাশে একটা পিক্‌দানি স্থাপন করিয়া আলোকাধারে আলো জ্বালিয়া—"আপনার সব কাজ ঠিক করিয়া দিলাম, এবার আমি যাই" বলিয়া অতর্কিতে সে এমন এক ভঙ্গিমা করিল, যাহাকে সুচতুরা গৃহিণীর কৌতুকাভিনয় বলিয়াই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ভাবিলাম এই রঙ্গটাও মন্দ নয়।

বিস্তীর্ণ বাড়ীর উপরের তলায় আর কেহ নাই। সে কামরার বাহিরে একপা বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি তাহাকে বলিলাম—একটা কথা শোন।

সে আমার আরও একটু নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল—কি কথা বলুন!

আমি বলিলাম—শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' কোথায়?

সে ঠোঁট দু'খানি আন্দোলিত করিয়া বলিল—দিদি তাহার ছেলেপুলে নিয়া ঘুমাইতেছে। মোটর গাড়ীর ঝাঁকানিতে খুব কাতরা হইয়াছে কি-না?

আমি বলিলাম—আমার অবস্থাও প্রায়-সে-রকম।

তারপর আর কি-কথা বলিব ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রইলাম।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—এবার আমি যাইতে পারি ?

আমি বলিলাম—হাঁ।

সে চলিয়া গেল।

পথশ্রমে দেহ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেও মনের মধ্যে নানারূপ ভাব-তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোর ৪টার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়ে আমার পূর্ব্বেই জাগিয়াছিলেন। তাঁহারা মোমবাতি জ্বালিয়া বুদ্ধের পূজা করিয়া। বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘের গুণ আবৃত্তি, অনিত্য-দুঃখঅনাত্মবিষয়ক স্মৃতি, সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রী-পোষণ প্রণালীগুলি ছন্দোবদ্ধ পালি-শ্লোকে এবং গদ্যে আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমি কান পাতিয়া শুনিয়া রহিলাম।

তারপর তাঁহারা বুদ্ধানুস্মৃতি—ধর্ম্মানুস্মৃতি—সঙ্ঘানুস্মৃতি—দেবতানুস্মৃতি—আনাপ্রাণানুস্মৃতি—শীলানুস্মৃতি—ত্যাগানুস্মৃতি—মরণানুস্মৃতি ইত্যাতি অনুস্মৃতি বিষয়ক ভাবনাগুলি আবৃত্তি করিতেছিলেন।

আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। তখনও বৃদ্ধা "মরণং মে ধ্রুবং, মরণং মে অনতীতো" অর্থাৎ মৃত্যুই আমার ধ্রুব, মৃত্যুকে আমি অতিক্রম করিতে পারি নাই, এই কথা দুইটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন।

বেশ একটা পবিত্র ভাব-ধারা আমার উচ্ছৃঙ্খল মনে, উদ্দাম প্রবৃত্তি দহনের জ্বালায়, যেন স্নিগ্ধ-চন্দনানুলেপ বুলাইয়া দিয়া গেল।

বৃদ্ধ ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক কথাগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে আমাকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মাষ্টার বাবুরও দেখিতেছি খুব ভোরে উঠা অভ্যাস।

আমি বলিলাম—হাঁ।

তিনি কুমারী 'টেন্‌গ্রুন্'কে ডাকিয়া বলিলেন—মাষ্টার বাবুর জন্যও মুখ-ধোয়ার জল আনিয়া দাও।

সে কূপ হইতে জল তুলিয়া ঘটীতে করিয়া জল আনিয়া রাখিয়াছিল। আমি শৌচকার্য্যাদি করিয়া মুখ হাত, পা ধুইবার জন্য কূপের ধারে গিয়া বসিলাম। কুমারী 'টেন্‌গ্রুন্' আমাকে জল তুলিয়া দিতেছিল। আমি সহানুভূতির স্বরে তাহাকে বলিলাম—তোমার কষ্ট করিবার দরকার নাই, আমি নিজেই জল তুলিতে পারি।

বাস্তবিকই তাহার প্রতি আমার একটু মায়া জন্মিয়াছিল। সেই মায়ার সঙ্গে মোহও একটু লুক্কায়িত ছিল।

কুমারী 'টেন্‌গ্রুন্' বলিল—মাষ্টার মশাই, আপনি আগন্তুক, আপনার ব্রত করা আমার ধর্ম্ম।

আমি বলিলাম—তোমার যে কষ্ট হইতেছে!

সে বলিল—কষ্ট কিসের? এ-সব কাজত আমি রোজই করিয়া থাকি।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—আমিত রোজ রোজ আসি নাই যে তুমি আমার জন্য কাজ করিয়াছিলে! আজ ত তোমার এটা দৈনন্দিন কার্য্য তালিকার বহির্ভূত!

সে বলিল—আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, শহুরে সৌখিনতার বাতাস আমাদের গায়ে লাগে নাই। এ-সব কাজ আমাদের মোটেই কষ্টকর বলিয়া মনে হয় না।

আমি বলিলাম—মনে না হইতে পারে, কিন্তু হয়রান হইতে হইবে ত?

সে বলিল—হয়রান হইব কেন? আমি ত দুইবেলা পেট ভরিয়া খাই, দেহেও যথেষ্ট বল আছে।

আমি স্বরে একটু মমতা মাখাইয়া বলিলাম—তোমাদেরকে অবলাই বলা হয়।

সে দৃষ্টি নিম্নদিকে সংবদ্ধ করিয়া আপন মনে বলিল—এই ভদ্রলোকের দেখিতেছি খুব দরদ বোধ আছে। তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—আপনি মুখ, হাত, পা ধুইয়া আসুন, আমাকে আপনার জন্য চা প্রস্তুত করিতে হইবে—বলিয়াই আমার জন্য জল তুলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

আমি মুখ, হাত, পা ধুইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে বারাণ্ডায় গিয়া বসিলাম। কুমারী 'টেনুঞ্রূন্' পিষ্টক সহ ডালা ভরিয়া চায়ের অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়া উপস্থিত হইয়া চা-পানের জন্য আমাকে আহ্বান করিল।

আমি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও চা-পানে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

তাঁহারা বলিলেন—বিলাতী ধরণের চা-পান করা আমাদের অভ্যাস নাই। আমরা দেশী চা-পান করি। তোমরা আজকালকার হাল্‌-ধরণের ছেলেমেয়ে, বিলাতী চাল-চলনের পক্ষপাতী। তাই তোমাদের জন্যই এই আয়োজন।

আমি বুঝিলাম, এই সব প্রাচীন প্রাচীনাদের অন্তরে প্রাচীন-জাতীয় ধারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আমার নিজের আপন-হারা-পর-ভাবাপন্ন মনোবৃত্তির জন্য ধিক্কারও আসিল। প্রাচীন ভারতের জীবন যাপনের যে ধারা আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, ঠিক সেই ধারাটিকেই ইঁহারা অন্তরে সন্নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মন এবং আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টার অনুবর্ত্তী, কে কাহাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে চায়, সেই বিষয়ে একটা প্রবল চেতনা মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তরুণীর প্রদত্ত ও আহৃত মৈত্রী ও শ্রদ্ধা দিয়া প্রস্তুত খাদ্য-সামগ্রীকে উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। আমার প্রাণে, তাহার সমগ্র অন্তর-ঢালা—যত্নকৃত, স্নেহামৃতে অভিষিক্ত খাদ্যসম্ভার পরিভোগ করিবার স্পৃহা বলবতী হইল। যখন আমি সেই মধুর রসাস্বাদনে ব্যাপৃত, তখন শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' ঘুম হইতে উঠিয়া 'ফায়া', 'ফায়া' শব্দ উচ্চারণ করিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগড়াইতেই আমার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল—ভাই, আমার বড় কষ্ট হইয়াছে, সেজন্য সকালে ঘুম ভাঙ্গে নাই।

আমি বলিলাম—দিদিমণি, তোমার বাপের বাড়ীতে আমাকে আনিয়া তোমার পরিজনবর্গের দ্বারা আমার উপর যেই স্নেহ বর্ষণ করিতেছ, তাহাতে আমার আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত প্রবাস-তাপিত মন সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল—সে-সব কথা এখন থাক্ ভাই; তুমি আগে খেয়ে নাও। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আসি।

আমি বিদেশী, বিজাতি, বিভাষী,—সম্ভবতঃ বিধর্ম্মী, তথাপি এসব নারীরা কেমন করিয়াই-বা এমন বিশ্বমৈত্রীর পরিচয় প্রদান করিতেছে? এত সহজে, এমন অত্যল্প সময়ের মধ্যে পরকে আপন করিয়া লওয়া, সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া তাহার সন্তোষবিধান করা—এসব মনের অনেকখানি প্রশস্ততা-লব্ধ ও বহুকাল-ব্যাপী সাধনার বস্তু। ইহাদের জীবন ধারায় এই সমস্ত সদ্‌গুণরাজি অতি সহজ-স্বাভাবিক ভাবে যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেজন্য মনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম।

নিজকে আর পর বলিয়া ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না। বেশ আমোদে আহ্লাদে, খাওয়ায়-দাওয়ায় তিন চারিদিন কাটিয়া গেল। আমার মত একজন বিশিষ্ট অতিথি তাঁহাদের গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গ্রামবাসী অন্যান্য সকলেরই মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছিল।

তাঁহার নিজ বাড়ীতে অনূঢ়া যুবতী এবং তাঁহার পাশের বাড়ীতে দুইজন বয়ঃপ্রাপ্তা অনূঢ়া ভ্রাতুষ্পুত্রী রহিয়াছে। সুতরাং গ্রাম্য লোকদের সাধারণ মনোবৃত্তিতে যেই ধারণাটা সহজে স্থান পায়, তাহারা সেই ধারণাই করিয়া বসিলেন। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'এর বিবাহ শহরবাসী একজন কাছারির কেরাণীর সঙ্গে হইয়াছে। বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং বৃদ্ধার ভগিনী-কন্যা সকলকেই ঐ রকম পদস্থ শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছা। সেইরূপ গুপ্ত-অভিপ্রায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মনে আছে বলিয়াই তাঁহাদের বাড়ীতে এই বিশিষ্ট অতিথির সমাগম। ইত্যাকার আলোচনা গ্রামময় বেশ প্রবল বেগে চলিয়াছিল। সেই বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না।

সেখানে পৌঁছার চতুর্থ দিনে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইলাম। আমার বিশিষ্ট বেশভূষা এবং বিশিষ্ট চেহারা দেখিয়া প্রায় সকলেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই একজন বাঙ্গালীকে তাঁহার ঔষধালয়ে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বাড়ীর দরজার উপর বিজ্ঞপ্তি-ফলকে "ইউনিপ্যাথী ঔষধালয়, চিকিৎসক—রাজকুমার বড়ুয়া" লেখা ছিল। আমার কৌতূহল হইল। তিনি একাগ্রমনে আমার দিকে তাকাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃই হৌক, বা সৌভাগ্যবশতঃই হৌক, আমার অঙ্গে বাঙ্গালীর পোষাক

পরিচ্ছদের কোন চিহ্ন ছিল না। আমার সমগ্র ব্রহ্ম-প্রবাস-জীবন বিজাতি, বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদের অন্তরালেই কাটিয়াছে। আমি ঘোটকপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সোজা বাংলায় তাঁহাকে বলিলাম,—আপনার দেশ কোথায়?

তিনি বলিলেন—চট্টগ্রাম।

লোকটি স্বল্পশিক্ষিত। তিনি আমাকে পরম সমাদরে সেখানে বসাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে আদেশ করিলেন। তাঁহার সে-দেশীয়-পত্নী স্তন্য-পান-নিরত শিশুটীকে কোলে করিয়াই আমার সাম্নে আসিয়া বলিলেন—আপনি কি ইহার জাত-ভাই?

আমি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—হাঁ।

তারপর তিনি চা প্রস্তুত করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

ইত্যবসরে তাঁহার পাশের বাড়ী হইতে চারি পাঁচজন মহিলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রবীণা ঘটকী ছিলেন।

তিনি আমাকে বলিলেন—আপনি কি টংগু-শহরে বাস করেন?

আমি বলিলাম—হাঁ।

তিনি বলিলেন—আপনি কি কোন কাছারির কেরাণী?

আমি বলিলাম—না।

তিনি বলিলেন—তবে কি আপনি চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন?

আমি বলিলাম—না।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কি আপনি ওকালতি করেন?

আমি বলিলাম—আমি শিক্ষাব্রতী।

তিনি বলিলেন--ও বুঝেছি, আপনি বিদ্বান্ লোক, সেই জন্যই ত গ্রামে রত্ন খুঁজিতে আসিয়াছেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম—কি রকম ?

তিনি বলিলেন—পণ্ডিত মহৌষধ পত্নী নির্ব্বাচনের জন্য নগর ছাড়িয়া গ্রাম-গ্রামান্তর খুঁজিয়া কোন এক ক্ষুদ্রগ্রামে গরীবের ঘরে অমরাদেবীর সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বুঝিলাম, গ্রাম্য-রমণী হইলেও ইনি বেশ মার্জ্জিতরুচি-সম্পন্না এবং রহস্যপ্রিয়া।

আমি হাসিয়া বলিলাম—মহৌষধ কুমারের মত অত বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কি তুলনা করা চলে, যে অমরাদেবীর মত পত্নীর খোঁজে আপনাদের গ্রামে আসিব ?

আমার কথা শুনিয়া আর একজন রসিকা, ঘটকীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন —'মা-হান্' তুমি মাষ্টার মশাইকে অমরাদেবীর সন্ধান বলিয়া দ ও না !

আমি বলিলাম—সে কষ্টটা আপনারা আর করিবেন না, আমি নিজেই প্রয়োজন বোধ করিলে সে ভার ঘাড়ে নিয়া বেড়াইব।

আমার কথা শুনিয়া সকলেই কিছুক্ষণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চা প্রস্তুত হইলে চা পান করিতে করিতে—ধর্ম্ম, শাস্ত্র, সমাজ, শিক্ষা, দেশাচার ইত্যাদি বিষয়ে বহু আলোচনা হইল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া ঘোটকপৃষ্ঠে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করার পর ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করিলাম দিবাভাগ বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া বৈকালিক চা পানের সময় বৃদ্ধ আমাকে সঙ্কোচভাবে বলিলেন—এসব অশিক্ষিত ছোট লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করিওনা, তাহাতে তোমার সম্মানের লাঘব হইতে পারে।

স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম্য মোড়লদের গলদ কোথায়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। বৈদেশিক ভাবধারার অনুকরণে, মোড়লদের ন্যায় গ্রাম্য লোকদেরও মেরুদণ্ড নুইয়া পড়িতেছে। মোড়ল মহাশয় তাঁহার জাতীয় ভাষায় সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিছু বিষয়-আসয় অৰ্জ্জিত হওয়ায় তিনি এই মোড়লগিরি পাইয়াছেন। সেইগ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী আরও দুই তিনটী গ্রামের ভূমি, রাজস্ব ও মাথট আদায় করার ভার এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা হইলে সে-সবের বিচার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ঐজন্য তাঁহার এত অহঙ্কার। সাধারণ গ্রাম্য লোকদের নিকট হইতে তিনি নিজকে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ তিন চারিখানা গ্রামের মধ্যে তিনি একজন ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন নাই—এই তাঁহার ভাব।

বিকাল বেলা বৃদ্ধ তাঁহার বাড়ী সাজানো-গোছানো, ধোয়া-মোছা ইত্যাদি কাজে লোক জন লাগাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম। সেদিন মহকুমা-হাকিম তাঁহার বাড়ীতে শুভাগমন করিবেন। সেইজন্যই তাঁহার এই উদ্যোগ-আয়োজন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং শ্যালিকা-পুত্রী দুইজনই মনোরম বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া রান্নাবান্নার কাজে লাগিয়া গেল। গ্রাম হইতে দুই চারিজন কর্ম্মিলোকও তিনি ডাকাইয়া আনিলেন। সকলকেই মহামান্য অতিথির সন্তোষ বিধানের জন্য নিয়োজিত করা হইল।

প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী। দ্বিতলে একটা প্রকোষ্ঠে আমি বাস করিতেছিলাম। আর তিনটী কামরা খালি ছিল। একটা কামরা মহকুমা-হাকিমের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য নীচের তলাই নির্দ্দিষ্ট হইল।

বৈকালে ৫টার সময় হাকিম-মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি আমারই মতো যুবক। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা অন্যান্য লোকজন সহ করযোড়ে তাঁহার সাম্‌নে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন। মহকুমা-হাকিম মহোদয় অহমিকার যেন পূর্ণ প্রতীক; ক্ষমতার দাপটে ধরাকে তিনি সরাজ্ঞান করিতেছেন। কৃত্রিম অশোভন ভাব-ভঙ্গিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র গ্রামকেই যেন তিনি তোলপাড় করিয়া তুলিলেন।

আমি অদূরে দাঁড়াইয়া মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলাম। মহকুমা-হাকিমকে সকলেই 'হাশ্বেংফয়া'—অর্থাৎ 'মহাপ্রভু' বলিয়াই সম্বোধন করিতে লাগিলেন। হাকিম-মহাশয় নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলকেই 'তুই' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছিলেন।

আমি গৃহস্বামী এবং গ্রাম-বাসীর কাতরতাদর্শনে এবং তাঁহাদের মানবাত্মার অবমাননার বেদনাভারে জর্জ্জরিত হইয়া, মহকুমা হাকিমের নিকটবর্ত্তী হইলাম। যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে আমি সম্মান করিয়াছি, যাঁহারা বয়সে আমার মাতৃ-পিতৃ সদৃশ, যাঁহারা সরলতার মূর্ত্ত-প্রতীক—গ্রাম্য ও নিরীহ ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া নির্ল্লজ্জভাবে সম্মান আদায় করার জন্য এই দাম্ভিক, সামান্য পদ-গৌরবের অসার গর্ব্বে গর্ব্বিত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটীর উপর আমার ঘৃণা জন্মিল। তিনি কটমট করিয়া আমার আপাদমস্তক দেখিয়া নিয়াই অবজ্ঞার স্বরে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ-টা কে?

বৃদ্ধ অত্যন্ত নম্রভাবে হাত যোড় করিয়া বলিলেন—ইনি টংগু-শহরের মেম্-সাহেবের স্কুলের শিক্ষক।

তিনি দ্বিতীয়বার আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলে, আমি পরিষ্কার বর্ম্মাভাষায় তাঁহাকে বলিলাম—মহাশয়, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ?

তিনি আমাকে ইংরেজীতে বলিলেন—আমি মহকুমা-হাকিম, গ্রাম পরিদর্শনে আসিয়াছি।

আমিও তখন পরিষ্কার ইংরেজীতে অনর্গলভাবে রাষ্ট্র-শাসননীতি এবং শাসকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম। মাঝখানে কথার একটু বিরাম দিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—আপনারা বেশ ধর্ম্মপরায়ণ, তারউপর বয়োবৃদ্ধ,—আমাদের সম্মানের পাত্র। আমাদের পাশে কেদারার উপর আসিয়া বসুন। নীচে ঐভাবে বসিয়া কেন ?

তাঁহারা সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—আমরা বেশ আছি। আমাদের হাকিম আসিয়াছেন। তাঁর পাশে কি আমরা ঐরকমভাবে বসিতে পারি ?

আমি বলিলাম—তিনি হাকিম হিসাবে সম্মানের পাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহার প্রতি যোগ্য সম্মান আপনারা প্রদর্শন করিয়াছেন, সে বিষয়ে আপনাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। তিনিও বেশ সদাশয় লোক। দান না করিয়া কেহই শুধু গ্রহণ করিয়া চলিতে পারেন না। আপনারা তাঁহাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন, তিনিও আপনাদেরকে যোগ্য সম্মান দান করিয়া সে সম্মান গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই বলিয়া বৃদ্ধকে আমাদের পাশে কেদারার উপর বসিবার জন্য আবার অনুরোধ করিলাম।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না।

এবার মহকুমা হাকিম মহাশয় নিজেই মৃদুভাবে বলিলেন—মোড়ল ! আপনারাও এখানে আসুন।

বৃদ্ধ মোড়ল বিনয়-ভারাক্রান্ত হইয়া বলিলেন—মহাপ্রভু, আপনিই বসুন, ব্যস্ত হইবেন না। আমরা বেশ আছি। আপনি আমাদের মহামান্য অতিথি। শাস্ত্র বলেন—'অতিথি সবাকার গুরু'।

আমি মাঝখানে বাধাদিয়া বলিয়া উঠিলাম—মামাবাবু, শাসন-ব্যাপারেই হোক, ধর্ম্ম-ব্যাপার অথবা সমাজ-ব্যাপারেই হোক, মানবাত্মার একত্ব বোধ না থাকিলে কোন বিষয়েই সুফল পাওয়া যায় না। আমি একজন শিক্ষাব্রতী; শিক্ষাদানের বেলা কিংবা শিক্ষার্থীদেরকে শাসনের বেলা অন্তরে অপরিসীম করুণা নিয়াই শিক্ষাদান ও শাসন করিয়া থাকি।

আমি আচার্য্য, আমি গুরু, ইহারা শিক্ষার্থী, ইহারা ছোট, ইহারা অজ্ঞ, ইহারা দুর্বিনীত, আর আমি শিক্ষিত, আমি শান্ত, আমি বিজ্ঞ, আমি সুবিনীত, আমি তাহাদের শাস্তা, তাহারা আমার শাসিত—এই সব ভাব - এই ধারণা অন্তর হইতে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া শিক্ষনীয় বিষয়কে মনোরম, কোমল, সরল, সুখবোধ্য করিয়াই, ভেদজ্ঞানরহিত হইয়া, পরম মমতার সহিত শিক্ষাদান করিতে হয়। ভীতি যেখানে আছে, যেখানে প্রীতি নাই, মৈত্রী নাই, অন্তরের প্রেম নাই, সহানুভূতি নাই। সেখানে জোর করিয়া ভয় দেখাইয়া ক্ষণিকের তরে শ্রদ্ধা এবং সুবাধ্যতা আদায় করার নাম আত্মপ্রবঞ্চনা—পরবিড়ম্বনা মাত্র। এ-ছাড়া আর কি হইতে পারে? যে শাসন হিতৈষণা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। মৈত্রীর, প্রেমের, হিতাকাঙ্ক্ষার পবিত্র বেদীতে বসিয়া থাকিতে পারিলেই শাসিতের,

শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে মন্দাকিনী ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহারই নাম শাসনের প্রকৃষ্ট পন্থা

আমার কথার চমৎকারিত্বে মহকুমা হাকিম মহাশয় অবনমিত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রসঙ্গটার গতি ভিন্নমুখে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিলেন—মাষ্টার মহাশয়, আপনার পক্ষে আইন ব্যাবসা করাই উচিত ছিল।

তাঁহার এই উক্তিতে আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম—আমি শিক্ষাব্রতীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া আইন ব্যাবসা গ্রহণ করিব কিনা তাহাই ভাবিতেছি।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই চা-পানের সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া তাহার বাড়ীস্থ কুমারী দুইজন ভক্তিনত হইয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত একজন খাদ্য-সম্ভার হাতে লইয়া এবং অপরা চায়ের বাটী ও চা-দানি হাতে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ কেদারা হইতে উঠিয়া বৃদ্ধসহ অন্যান্য লোকজন যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া বসিলাম। ইহাতে মহকুমা হাকিম মহাপ্রভুরও চৈতন্য হইল। তিনিও তাঁহার সম্মানের আসন হইতে অবতরণ করিয়া আমার পাশে আসিয়া উপবেশন করিলেন। চা-পান করিতে করিতে তাঁহার সহিত অনেক বিষয় আলোচনা হইল। দেশাচার, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিনি আমার সহিত একমত হইলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে সাম্য-মৈত্রীর আদর্শটাকেই তিনি গ্রহণীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কর্ত্তব্যের অনুরোধে উপরিস্থের মন যোগাইবার জন্য যে তাঁহাদিগকে প্রায় সব সময়েই কৃত্রিমতার খোলস পরিয়া থাকিতে হয়, সেকথাও তিনি বলিলেন।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে সত্যিকার গলদ কোথায়, কি করিয়া তাহার প্রতীকার করা যায়, সে বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলাম—রুদ্র-নীতি, ভিন্ন-ভাব, বিজেতার স্পর্দ্ধা,—বিজিতের শ্রদ্ধা আনয়নের প্রধান অন্তরায়। সাম্য-মৈত্রী-হিতাকাঙ্ক্ষাই এ-পথের পরম সহায়। ধর্ম্মনীতিতে যাহা সত্য, যাহা পথ; সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেও তাহাই সত্য পন্থা। দৈহিক বলে বা দণ্ডদানে ভীতির সঞ্চারে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া শ্রদ্ধা আদায় করিবার প্রচেষ্টা নিতান্তই অসার, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। স্বভাবকে বাদ দিয়া এসব বিষয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করাটা উভয়পক্ষেই বিড়ম্বনা ছাড়া কিছুই নয়।

যৌবনকাল সমগ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং মৈত্রী-করুণা ইত্যাদি সদ্‌গুণের প্রসারতার প্রধান সময়। ইহা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান। যিনি বা যাঁহারা প্রকৃতির এই অপরিসীম স্নেহের দানকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিয়া কপটতার খোলস পরিয়া মান-মদ-মত্ত হন, তাঁহারা সামান্য নশ্বর অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বিষয়ের জন্য স্বর্গীয় অমৃত-ধারার সুশীতল রসে অভিষিক্ত হওয়া থেকে নিজকে বঞ্চিত করেন। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যাহারা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, নিজেদের ভাগ্যহীনতার বিষয় স্মরণ করিয়া যাহারা ক্ষুণ্ণ, প্রপীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে পরম স্নেহভরে বুকে টানিয়া লইয়া তাহাদের সেই ক্ষুণ্ণতা, পীড়া ও দুর্ব্বলতাটাকে মুছিয়া দিতে হইবে। আহা! এসব পীড়িত, আর্ত্ত, মুগ্ধ, বঞ্চিত, সর্ব্বহারার দলকে স্নেহপরায়ণা, সুশিক্ষিতা, সহৃদয়া করুণার প্রতীক স্বরূপা শুশ্রূষাকারিণীরা যেমন প্রাণ ঢালিয়া-সেবা করেন, অজ্ঞতাজনিত, রোগজনিত প্রলাপের এবং বিকারের ঘোরে কৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদের রোগ-মুক্তির কামনাতেই এবং সেই চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করেন—ঠিক সেই-

ভাবেই এই আর্ত্ত, পীড়িত ও দুর্গতদিগের বেদনা, জ্বালা, মোহ, কালিমা বিদূরিত করিতে হইবে। রুদ্রমূর্ত্তিতে নয়, শস্ত্র বা দণ্ডদানের ভয়ে ভীত—সন্ত্রস্ত করিয়া নয়,—অভয়-বাণীতে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট-মুক্তির উপায় কৌশলেই তাহা সম্পাদন করিতে হয়।

তিনি নিবিষ্টচিত্তে আমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন,—এতদিন আমি আপন সত্ত্বা বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই। সমাজে প্রতিষ্ঠা, পদ-মর্য্যাদা, অর্থ ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মোহে মুগ্ধ হইয়া কেবল অকিঞ্চিৎকর পদার্থের পেছনেই আমি ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। মিথ্যার মোহে, স্বপ্নের ঘোরে, সত্যকে—বাস্তবকে উপলব্ধি করা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ধর্ম্মগত, জাতিগত, সংস্কারগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ধার-করা জ্ঞানের মোহে, পদের মোহে, ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহার তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিজের যা' কিছু সমস্তই অসার, অকিঞ্চিৎকর; পরেরটাই সত্য এবং সার্থক। সুতরাং নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব পরিহার করিয়া পর-কথিত সত্য ও বাস্তবের দিকেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ ছুটিয়া চলিয়াছি। ইহার নিবৃত্তি কোথায় জানি না!

তিনি তথায় দুইদিন মাত্র অবস্থান করিয়া নিজের কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন। বৈদেশিক ভাবধারা এবং সংস্কৃতি পরাধীন মনের উপর যত বেশী ছাপ মারিতে পারে, ততটুকু স্বাধীন মনের উপর পারে না। ব্যক্তিবিশেষে ইহার অন্যথা দেখা গেলেও বেশীরভাগ লোক নিজের সত্ত্বা ভুলিয়াই যায়। কিন্তু কোন কারণে ন্যায়ধর্ম্মের তাড়নায় ভুল বুঝিতে পারিলেও তাহা শোধরাইবার উপায় থাকে না। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে অপারগ ব্যক্তিদের যখন ন্যায় ও আত্মসম্মান

বোধ উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তাঁহারা বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

* * * * * *

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন'এর শরীর খারাপ বলিয়া সহসা টংগু ফিরিয়া আসিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকেও সেখানে আরও কিছুদিন অবস্থান করিবার জন্য তিনি অনুরোধ জানাইলেন।

গ্রাম্য-জীবন শান্তিময়, কোলাহল-বর্জ্জিত স্বীকার করি; কিন্তু কর্ম্ম-প্রেরণা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা গ্রামবাসীর অন্তরে বিশেষ স্থান পায় না। প্রথম তিন চারি দিন যদিও একটা নূতন স্থান দর্শনে আনন্দে কাটিয়াছিল, কিন্তু তারপর আর সেই ভাব রহিল না। শহরে পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচি—এই রকম অবস্থা। ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম-ভ্রমণ ইত্যাদি খুব রীতিমত চলিলেও শহরের কোলাহলের জন্য যেন মন আকুল হইয়া উঠিল।

আমি শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'কে বলিলাম,—দিদি, তোমার আর কয়দিন দেরী হইবে? আমার যে আর ভাল লাগে না।

সে হাসিয়া বলিল—এত তাড়াতাড়ি কেন ভাই, তোমার যে ছুটি আছে। আরও কয়দিন থাক, আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় কর। শুধু এই গ্রাম কেন, আশে পাশে যত গ্রাম আছে, সব ঘুরিয়া বেড়াও। আমি একটু সুস্থ হইলে ফিরিয়া যাইব।

তার পর আমাকে খুসী করিবার জন্যই যেন তিনি হাসিয়া বলিলেন—তুমি মহৌষধ কুমারের গল্প পড়িয়াছ ত? মহৌষধ কুমার যে মনোমত পত্নী নির্ব্বাচনের জন্য নগর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি জান না? মহৌষধের মত অত বড় রাজ-পণ্ডিতও

গ্রাম হইতে পত্নীরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে ঃ—

"বঁধু ত বঁধু গ্রাম্য বধূ,
তা'দের হৃদিভরা মধু।"

নগর-কুমারীদের যত্ন-মার্জ্জিত বর্ণের ঔজ্জ্বল্য থাকিতে পারে, পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য, চলন-ভঙ্গিমা, আদব-কায়দা, কৃত্রিম-ভাবভঙ্গি আপাতমধুর হইতে পারে, কিন্তু গ্রামের সাদাসিদাভাব, সহজ অভ্যাস,স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, অনাবিল গতি আপাত মনোহারী না হইতে পারে, কিন্তু এসব একেবারে খাঁটি, প্রাণবন্ত।

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—দিদি, তোমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য কি?

তিনি বলিলেন—বিশেষ উদ্দেশ্য কিছু নয়। সংসারের যা' ধারা, সেই কথাটাই তোমাকে বুঝাইবার জন্য ইহা বলিতেছি।

আমি বলিলাম—তার প্রয়োজন কি?

তিনি বলিলেন—সংসার-জীবনে গার্হস্থ্যধর্ম্মে এসবের বহু প্রয়োজন আছে। তোমাকে বিদেশী বলিয়া মনে হয় না, বিধর্ম্মী বলিয়াও আমার ভাবিতে ইচ্ছা করে না। তুমি যেন বহু জন্মেই আমাদের আপন ছিলে। এই ভাবটি তোমাকে দেখিয়া প্রথম থেকেই আমার মনে জাগ্রত হইয়াছিল।

মা কাল বলিয়াছিলেন, তোমাকে দেখিয়া অবধি নাকি তাঁহার অন্তরে পুত্রবৎ স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে। বাবাও তাই বলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, ছুটির বাকী দিনগুলি তুমি এখানেই কাটাইয়া যাও।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এঁদের উদ্দেশ্য কি? কেন আমাকে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার

সম্মুখীন হইতে হইতেছে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। তারপর তাঁহাকে বলিলাম—ইহা তোমার জন্মভূমি, তোমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু আমার কাছে নয়। আমাকে ছাড়িয়া দাও।

সে বলিল—তাহা কি হয়? চার ধারের সব গ্রামগুলি ঘুরিয়া দেখ। আমার কাকিমার সাথে আলাপ পরিচয় কর। আজ বৈকালে আমাদের বাড়ীতে পরিত্রাণ পাঠের জন্য বাবা এখানকার বিহারের ভিক্ষু মহোদয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। পরিত্রাণ-পাঠ শ্রবণ কর, ভিক্ষু মহোদয়ের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয় আলোচনা কর। তোমার যাওয়ার বিশেষ ত কোন তাড়াতাড়ি নাই।

আমি বলিলাম—আছে বৈ কি?

তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—বোধহয়, তোমার সাম্নের বাড়ীর বান্ধবীর জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছে!

আমি তাহার সেই কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবার বলিলেন—তা করিবে বৈ কি! ঐ রকম সুন্দরী তো আমাদের গ্রামে নাই। সেজন্য যদি তোমার মন চঞ্চল হয়, তুমি যাইতে পার, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যদি সুখী হইতে চাও, তাহা হইলে সু-ভর, সু-পোষ গ্রাম্য-কুমারী, নগর-কুমারীর অপেক্ষা ভাল।

আমি এবার একটু অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া বলিলাম—দিদি, তুমি কি সকলের মনের ভাব বুঝিতে পার?

তিনি বলিলেন—বহুদিন সংসার করিয়াছি। যাহাদের সংস্রবে থাকিয়া সংসারে চলিতে হয়, অন্ততঃপক্ষে তাহাদের মনের ভাবটা বুঝিতে পারি বৈ কি! না বুঝিতে পারিলে চলিবেই বা কেন?

আমি বলিলাম—আচ্ছা, সে কথা থাক।

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—থাক্‌বে বৈ কি; এখনই যে আমাদের গুরুদেব আসিয়া পড়িবেন। তিনি অন্তরায়-বিনাশক পরিত্রাণ পাঠ করিবেন, আমরা শুনিব। 'মাটেন্‌এ্নু' ফুল তুলিতে গিয়াছে। মঙ্গল-ঘট সাজাইতে হইবে। আমারও-ত একটু পুণ্যসঞ্চয় করা দরকার।

আমি বলিলাম—ভাল। তুমি যাও, সে-সবের যোগাড়-যন্ত্র করগে।

সে উঠিয়া গেল। আমার মনটাও হঠাৎ খাপছাড়া হইল। কি করিব. কোন্‌দিকে যাইব, তাহাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম। এমন সময়, কুমারী 'টেন্‌এ্নু' এক সাজি ফুল হাতে লইয়া আসিয়া বলিল—মাষ্টারমহাশয়, বড়দিদি আপনাকে ডাক্‌ছেন।

আদেশ শ্রবণমাত্রেই আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্‌' যেখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া পরিত্রাণ পাঠের সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন, তাহার সঙ্গে সেখানে গিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি বলিলেন,—আমাকে একটু সহায়তা কর।

আমি বলিলাম,—কোন্‌ কাজটা করিতে হইবে আমাকে বলিয়া দাও।

তিনি বলিলেন—মঙ্গল-ঘটের গলায় পরাইবার জন্য কয়েকটা ফুলের-মালা গাঁথিয়া দাও।

আমি হাসিয়া বলিলাম—দিদি, তুমি ঠিক লোকটী চিনিয়াছ। আমিই-যে মালা গাঁথিতে পারিব, সেটা তুমি কি করিয়া বুঝিয়াছিলে? যাক্, যে করিয়াই বুঝিয়া থাক, কিন্তু দিদি, আমার একটী নিবেদন আছে। আমি বলি কি, যে পুষ্পচয়ন করিয়াছে. সে-ই মালা গাঁথুক।

আমি ঘটটা সাজাইয়া দেই, আর পরিত্রাণের রক্ষা-বন্ধনীর-সূত্র তিন গুণ করিয়া তুলি। ঐ কাজটাই আমাকে মানাইবে ভালো। আর দ্বিতীয় কাজটি তোমার বোন্‌কে দাও। ভাই-বোনের মধ্যে কাজের ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়ার অধিকার যে তোমারই।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' মৃদু-মধুর হাসিয়া কুমারী 'টেন্‌ঞ্‌ন্‌'এর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—মাষ্টারের কথা শুনতে পাচ্ছ?

সে যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া গিয়াছিল। তার কি বলা উচিত, সেটা যেন সে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একবার আমার মুখের দিকে, আর একবার তাহার দিদির মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্‌' তাহার এই ভাব-বিমূঢ়তার জন্য মনে মনে খুসী হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এও একটা পূর্ব্বরাগের লক্ষণ। তারপর স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—মালাগাঁথাটা মেয়েদের হাতেই ভাল সাজে। তুই সেই কাজটা কর্।

আমি নিজের কাজ করিতে করিতে এক একবার তাহার কার্য্যের প্রতিও দৃষ্টি করিতেছিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সে খুব নিবিষ্টচিত্তা হইয়া কাজ করিতেছে না। কাজের ফাঁকে সে এক একবার আমার দিকে তাকাইতেছিল। যুবক-যুবতীদের মধ্যে সান্নিধ্য জিনিষটা বড় বেশী ভাল নয়। সান্নিধ্যে অনর্থ ঘটে, বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত করে। সে সম্বন্ধে চাণক্য-পণ্ডিতের ঘৃত-কুম্ভ ও তপ্তাঙ্গার একত্র স্থাপন না করার পরামর্শ বেশ গ্রহণীয় বলিয়া আমার মনে হয়। উভয়েরই কার্য্য ছিল, ধর্ম্ম-শ্রবণের আয়োজন করিয়া দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা,—তৃষ্ণার উদ্রেক করা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিতেছিল। যাহা হৌক,

আনমনে হাতের কাজ হাতে, মনের কাজ মনে সে সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল।

বিচিত্রতা নিয়াই সংসার। বিচিত্রতা না থাকিলে সংসারে বিচরণ করা কষ্টকর হইত। আমার মনে হয়, বৈচত্র্যহীন হইলে সংসার একেবারে অচল হইয়া যাইত।

একটা উঁচু চৌকি শ্বেতবস্ত্র দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দূর্ব্বা, আম্র-পল্লব, বট-পল্লব ও কদলীপত্র-কোরকে-সজ্জিত কাংস্যনির্ম্মিত-ঘট তদুপরি স্থাপন করিয়া পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করার পর তাহার চতুঃপার্শ্বে ধান, খৈ ছড়াইয়া দেওয়া হইল। মঙ্গল-ঘটের সম্মুখভাগে আর একটা চৌকিতে মোমবাতি জ্বালাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাদভাগে একটা খাট পাতিয়া গুরুজীর আসন করা হইল।

যথাসময়ে গুরুদেব আসিয়া পারিষদবর্গ সকলকে বুদ্ধ-কথিত পঞ্চ-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিত্রাণ-পাঠ আরম্ভ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই শ্রদ্ধাভরে নীরব হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

পরিত্রাণ-পাঠ শেষ হইলে গুরুদেব অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-বিষয়ক উপদেশের সঙ্গে দান, শীল, ভাবনা ইত্যাদি পুণ্যকার্য্য যাহাতে নিত্য অনুষ্ঠিত হয়, সে-বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন।

বিকাল-ভোজন ভিক্ষুদের শীলাচার বিরুদ্ধ বলিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের বাড়ীতে পিণ্ড গ্রহণের জন্য গুরুদেবকে সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করা হইল। তিনি তুষ্ণীভূত হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সেই ধর্ম্ম সভায় উপবিষ্ট থাকিতেই শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' অত্যন্ত সরলান্তঃকরণে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে একসঙ্গে ধর্ম্মকার্য্য সাধন করার পুণ্যফলহেতু, এই জন্মে তুমি ভিন্ন-দেশবাসী হইলেও তোমার সঙ্গে

আমাদের দেখা হইয়াছে। আর ইহজন্মে একত্রে এই পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করা হেতু পরবর্ত্তী জন্মেও তোমার সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিব।

আর একটা কথা, সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে যেমন উদকে উৎপল প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মের সন্নিবাসহেতু ইহজন্মে প্রেমের—প্রীতির সঞ্চার হয়।

তাহার কথা গভীর অর্থ-ব্যঞ্জক হইলেও অনায়াসেই আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার এই উক্তিতে তিনি আমাকে কি বুঝাইতে চান, আর আমার কাছে কি প্রত্যাশা করেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমিও তেমনি মধুরভাবে তাঁহাকে বলিলাম—দিদি, তুমি আমায় লজ্জা দিও না। এম্‌নিই তোমার স্নেহের দানের বোঝা আমার ভারী হইয়াছে; এই বোঝার উপর আর শাকের আঁটি চাপাইবার চেষ্টা করিও না।

কুমারী 'টেন্‌ঞ্চুন' আমার কথার ঠিক অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটু মলিনমুখে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাঁহার মাতা-পিতাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন—বাবা-মাও এখানে আছেন। বলি ভাই, তোমার এই খাপছাড়া ভাব, ছন্নছাড়া গতি, লক্ষ্যহীন-জীবনধারা বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন তরণীর মত কি-ভাবে যে চালিত হইবে, তাহাই আমি ভাবি।

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—সেই ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না, দিদি। এই জীবন-তরী কাণ্ডারী-বিহীন নয়। তুমি যেই কাণ্ডারীর ইঙ্গিত করিতেছ, সেই অন্ধ কাণ্ডারীতে আমার কোন প্রয়োজনও নাই। আমি চাই দৃষ্টি, আমি চাই আলো।

অত্যন্ত আশায় নিরাশ হইয়া তিনি ব্যথিতস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, খাইয়া-দাইয়া বিশ্রাম করগে।

পরদিন সকালবেলা বিহার হইতে গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিবার জন্য বৃদ্ধ আমাকে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহার সেই আদেশ পালন করিলাম। গুরুদেব পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এখানে আমার আগমনের কারণ যে একমাত্র মোড়লের শ্যালিকা-পুত্রী, এই ধারণা তাঁহারও হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন—আমি গ্রামাভ্যন্তরে গমনোপযোগীভাবে চীবর পরিমণ্ডল করিয়া আসি, তুমি এক মিনিট বসো।

ঠিক এক মিনিট পরেই তিনি আসিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি মোড়লের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ভোজনশেষে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—এই ভদ্র-যুবকটীর বেশ ধর্ম্ম-প্রবণতা আছে, অন্তর সরল—বেশ দয়ালু। আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে প্রায় সময়েই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এইজন্য আমার মনেও বেশ আনন্দ হইতেছে। সৎ, সরল, ধর্ম্মপ্রবণ লোকের সঙ্গে সতত দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গুরুদেবের এই কথায় তাঁহাদের বাড়ীস্থ সকলেরই মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আর না। শীঘ্র স্থানত্যাগ না করিলে হয়ত বা বাঁধা পড়িয়া যাইব।

* * * * * * * * *

ভোজনশেষে দিবা-বিশ্রামের পর বিকালবেলা আমি দুই-তিনটী গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সান্ধ্য-ভোজনের পর শ্রীমতী

'ফোয়াশেন্'কে আমি বলিলাম—দিদি, কাল সকালে কি যাইতে পারিবে না? আর এই মটরবাসের পথ ছাড়া আমার মনে হয় অন্যপথও আছে—যেখান দিয়া যাইতে তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। কাল বিকালে আমি 'কানসেক্' গ্রামের লোকদের কাছ থেকে সে পথের সন্ধান জানিয়া আসিয়াছি। দেড় ক্রোশ রাস্তা আস্তে আস্তে কি তুমি খুব ভোরে হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না? তারপর নদী পার হইয়া একটু গেলেই লৌহ বর্ত্ম। আর একটু অগ্রসর হইলেই লৌহ-বর্ত্ম-যানের বিরামস্থান। আমার মনে হয়, তুমি বেশ যাইতে পারিবে।

সে হাসিয়া বলিল—সে-পথের আবিষ্কারও তুমি করিয়াছ? আচ্ছা ভাই, দেখি কাল যাইতে পারি কি-না।

তারপরদিন ভোরে ৪টায় উঠিয়া, যাওয়ার জন্য আমি তাড়াহুড়া আরম্ভ করিলাম।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' বলিলেন—আচ্ছা ভাই, তাই হইবে। ৬টার সময় আমরা এখান থেকে রওনা হইব।

নদী পার হইবার সময় নৌকায় আরোহণ করিয়া কুমারী 'ফোয়াসী' বলিল—দিদি, মাসিমার বাড়ীতে কি আমাদের জায়গা হইবে?

শ্রীমতী 'ফেয়াশেন্' বলিলেন—তুই কি মনে করিয়াছিস্ যে, সে-সব বিষয় কিছু চিন্তা না করিয়া, শহরে নিয়া গিয়া আমি তোকে রাস্তার রাখিয়া দিব? এই-ত অধ্যাপক বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁর বাড়ীতেও যথেষ্ট স্থান। একথা বলিয়াই একটু মৃদুহাস্য করিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আমি হাত দিয়া নদীজল স্পর্শ করিয়া দেহমধ্যস্থ চিন্তা-বাত-বিক্ষুব্ধ

সঞ্চরমান জীবনের মধ্যে তরল গতিশীল নদী-জীবনের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিলাম। ইহাও মনে হইল, এই দেহ-জীবন নদী-জীবনে নিমজ্জিত করিয়া সুশীতল হই। নদীগত-জীবনের যা' লক্ষ্য—যা' গতি, দেহগত-জীবনেরও সেই লক্ষ্য, সেই গতি। উভয় জীবনই বিভিন্ন ধারায় লক্ষ্যপথে চলিয়াছে। পথ ভিন্ন হইলেও চরম-উদ্দেশ্য-এক — আত্ম-বিস্মরণ, সঙ্কীর্ণতা-বর্জ্জন—গণ্ডী-অতিক্রম—বন্ধন-মুক্তি।

কুমারী 'ফোয়াসী' শ্রীমতী 'ফোয়াশেন'এর পিসতুতো ভগিনী। পূর্ব্বে কোন্ একটা গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে শিশু-শ্রেণীতে সে শিক্ষাদান করিত। স্বগ্রাম ছাড়িয়া ভিন্নগ্রামে গিয়া মাতা-পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে হয় বলিয়া তাহার মাতা-পিতা কার্য্যত্যাগ করাইয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য—কোন একটি সুপাত্রের সন্ধান করিয়া পরিণীতা করা।

নদীর অপর পারে গিয়া পৌছিলে আমরা যখন ভোজনশালায় বসিয়া জলযোগ করিতেছিলাম, সে তখন অজানা-অচেনার ভাব পরিহার করিয়া শ্রীমতী 'ফোয়াশেন'এর নির্দ্দেশে স্বচ্ছন্দভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করার অভিপ্রায়ে বলিল—আপনি নাকি পুস্তক রচনা করেন ?

আমিও সরলভাবে উত্তর দিলাম—হাঁ।

সে বলিল — আপনি কি ইংরেজী ভাষায় পুস্তক-রচনা করেন, না কি আমাদের বর্ম্মী-ভাষায় করেন ?

আমি বলিলাম—দেশভাষার প্রতি মমত্ববোধ থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দেশভাষার সঙ্গেই দেশবাসীর প্রাণের সংযোগ, বিদেশী-ভাষার সঙ্গে তো নয়।

সে একটু হাসিয়া বলিল—আমার মতও তাই। দেখুন, বিদেশী-ভাষা দেশে প্রসার লাভ করায় মানুষের মনোবৃত্তিও যেন খাপছাড়া হইয়া যাইতেছে। নিজের ভাব, নিজের ভাষা, নিজের ধর্ম্মগত-বিশ্বাস, নিজের জন্মগত-সংস্কার, নিজেদের আচার-নিষ্ঠা, হাব-ভাব, চাল-চলন ইত্যাদির প্রতি বীতস্পৃহা এবং পরকীয় ঐ গুণগুলির জন্য বৃথা আস্ফালন, বৃথা চেষ্টাই শুধু চলিতেছে।

এই সব গুরুতর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় আমার মন সব সময় সচেতন। আমি উৎসাহভরে তাহাকে বলিলাম—আমি দেশীয় ভাষায়ই পুস্তক-রচনা করি। বিদেশী ভাষায় নয়।

সে এবার খুসী হইয়াই বলিল—ঐ বিষয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করিতে পারিব।

আমি বলিলাম—কিরূপে ?

সে বলিল—আপনি মুখে বলিবেন, আমি লিখিয়া যাইব।

আমি বলিলাম—আচ্ছা যদি পার, তা'তে আমার আপত্তি নাই।

সে যেন দর্প করিয়াই বলিল—আমার মাতৃভাষা আমি পারিব না কেন ?

আমি বলিলাম—মাতৃভাষা হইলেই কি সকলে লিখিতে পারে ?

সে বলিল—আমি যে অনেক পড়াশুনা করিয়াছি।

আমি বলিলাম—কতটা পড়িয়াছ ?

সে বলিল—আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছি ; তার উপর নিম্নতন শিক্ষয়িত্রীর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণা হইয়াছি, আমি পারিব না কেন ?

আমি বলিলাম—তাহার চেয়ে বেশী পড়িয়াও-তো অনেকে পারে না।

সে বলিল—আমি জাতিতে বর্ম্মা। বর্ম্মাভাষায় কেন আমি অভিজ্ঞা হইব না?

আমি বলিলাম—এখন থেকে বেশী আস্ফালন করিয়া কোন লাভ নাই, কার্য্যে পরিচয় পাওয়া যাইবে।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, চীনা-পত্নী ও অন্ধ-পত্নী নিজ নিজ সন্তানগণ নিয়া কুশলেই আছে। আমার বালক-ভৃত্যটীরও কোন অসুবিধা হয় নাই।

বিকালবেলা 'ড-এ' আসিয়া বলিলেন—পাড়াগাঁয়ে গিয়া কেমন ছিলে?

আমি বলিলাম—বেশ ভালই ছিলাম। সেই গ্রামের মোড়ল এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই আমাকে খুব স্নেহ-যত্ন করিয়াছিলেন। সে সব আমি ভুলিতে পারিব না।

'ড-এ' বলিলেন—তোমাকে স্নেহ-যত্ন না করিয়া কি কেউ পারে?

আমি বলিলাম—মাসিমা, একটা বিষয়ে আমি নিজেকে বড়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি, সেটা আমার জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল ছাড়া আর কিছু নয়। বহুদিন হইতে আমি বহুলোকের সংস্রবে দিন কাটাইয়াছি। সব সময় সৎলোকের সঙ্গেই আমার দেখা হইয়াছে।

তিনি বলিলেন—তুমি নিজে সৎ বলিয়াই সতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়। 'আপন ভাল তো জগৎ ভাল।' যে ভাল, ভালর সঙ্গে তাহার দেখা হইবেই।

ইত্যবসরে ছেলে দুইটীকে ঘুম পাড়াইয়া চীনা-পত্নীর সঙ্গে অন্ধ-পত্নী ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অন্ধ-পত্নী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমাকে যিনি সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? তিনি কি আসেন নাই?

আমি বলিলাম—তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার মাসিমার বাড়ীতে আছেন। এখানে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে একজন সঙ্গিনীও আসিয়াছে কিনা!

চীনা-পত্নী একটু বিদ্রূপ করিয়া বলিল—তিনি তোমাকে সঙ্গিনীর খোঁজেই নিয়া গিয়াছিলেন না-কি?

'ড-এ' সাম্‌নে ছিলেন বলিয়া আমি তাহার এই রহস্যালাপে দুঃখিত হইলাম, সঙ্কুচিতও হইলাম। কাজেই কোন উত্তর না-দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

'ড-এ' আমাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—আমি এখন যাই। আমার সান্ধ্যকৃত্য—ত্রিরত্নের অর্চ্চনা, স্মৃত্যুপস্থান-ভাবনা, মৈত্রী-চিন্তা করা ইত্যাদি অনেক কাজ আছে,—বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাওয়ার ক্ষণকাল পরেই কুমারী 'থেইন্' আমার বাড়ীর নীচে-তলায় যেখানে চীনা-পত্নী থাকিত, সেদিকে গিয়া 'দিদিরা কোথায় গেলে সব, কাহাকেও দেখিতে পাই না কেন'—বলিয়া নিজের মনেই কথা বলিতে বলিতে বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল।

তাহার সমস্ত কথাগুলিই আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম। চীনা-পত্নীও তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে বাড়ীর উপর উঠিয়া আসিতে আহ্বান করিল। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে উঠিতেই বলিতে লাগিল—সমস্ত বাড়ীর উপর তোমরা বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছ। যিনি বাড়ীর অধিপতি, তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেই আমি সব বলিয়া দিব।

চীনা-পত্নী বলিল—তিনি আসিলে কি তুমি একথা তাঁহাকে বলিয়া দিয়া আমাদের মাথা নেওয়াইবে? এত শীগ্‌গীর কোন্ সাহসেই বা তুমি বাড়ীর অধিপত্নীর মতো কথা বলিতেছ? একবার এদিকে এসতো, দেখি তোমার মুখখানা!

'এইতো আমি আসিয়াছি' বলিয়াই সে দ্রুতপদে তাহার সম্মুখীন হইতে গিয়া, আমার মুখের উপর প্রথমেই তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। দৃষ্টি নিপতিত হওয়া মাত্রেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। লজ্জায় যেন সে মাটিতে মিশিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে—এই রকম অবস্থা। আমি যে তাহার সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছি, সে-সব বুঝিতে পারিয়া সে আরও সঙ্কুচিতা ও আড়ষ্টা হইয়া গেল।

চীনা-পত্নী আদর করিয়া বলিল—ভয় কিসের! লজ্জা কিসের! দুইদিন পরে তো এই লজ্জা থাকিবে না, ভয়ও করিতে হইবে না। এখন থেকে ক্রমে সে-সব পরিহার করিবার চেষ্টা কর্। তোদের দু'খানা হাত যোড় করিয়া দিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়।

একথায় কুমারী 'থেইন্' অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। আমাদের দিকে একবার তাকাইয়াও দেখিল না। যখন সে আবার ধীরপদে নামিয়া যাইবার জন্য সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন চীনা-পত্নী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পাশে বসাইয়া, আদর করিয়া বলিল—তুই যে একেবারে লজ্জাবতী-লতাটি হইয়া আছিস্। দেখেই ভয়ে জড়সড়, আর ছুঁইলেই যেন মর মর; গতিক বড় ভাল দেখা যাচ্ছে না। এসব যে রোগ। আচ্ছা, আমি ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিব।

অন্ধ-পত্নী বলিল—ঐসব নারীচিত্তের স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য। ঐ-সব ভাব যেখানে নাই, সেখানে আকর্ষণী শক্তিটাও কম। ঐ যে ফুটে ফুটে ফুটে না দেখে ডর ছুঁ'লে মর ; বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, ইত্যাদি ভাব—প্রকৃতির গোপন-সৌন্দর্য্য, তার আকর্ষণী-শক্তির গূঢ়-অভিব্যক্তি।

চীনা-পত্নী বলিল—তাহা সত্য, কিন্তু আধুনিক যুগে সেই সব মনোবৃত্তিগুলিকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। শালীনতার পরিবর্ত্তে অসঙ্কোচ, অবাধগতি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, ঘরে বাহিরে সমান অধিকার, পশ্চিমদেশের হালচাল বেশ প্রসারলাভ করিয়াছে। বাস্তবিক, সে-সব ভাল মনে করিয়া আধুনিক যুগের মেয়েরা গ্রহণ করিতেছে।

অন্ধ-পত্নী বলিল—তাহা করুক, করিয়া যদি প্রাচীন ভাবধারাটাকে একেবারে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে জীবনটাকে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করা চলিবে না।

চীনা-পত্নী বলিল—কেন শুনি ?

অন্ধ-পত্নী বলিল—যেখানে বিকৃতি আসে, সেখানেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়। সরস, সুন্দর, মনোমুগ্ধকর ভাবগুলি মলিন হয়—বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

আমি তাহাদের দুইজনের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—তোমরা যাহার কাছে বসিয়া এসব ব্যক্ত করিতেছ, এবং যাহার জন্য এত মাথা ঘামাইতেছ, সে কিসের ভক্ত, কোন্ জিনিষটী সে ভালবাসে, সে সম্বন্ধে একটু তলাইয়া দেখিয়াছ কি? যাহার বাহিরের চোখ নাই, তাহাকে আমরা অন্ধ বলি ; কিন্তু তার অভ্যন্তরে যে একটা দৃষ্টি আছে তাহার সন্ধান তুমি রাখ কি দিদিমণি ?

চীনা-পত্নী হাসিয়া বলিল—ভাই, আমরা ঐসব ভাল বুঝি; তোমার বিজ্ঞতা এখানে অজ্ঞতায় পরিণত হইবে। একথাটী ঠিক জানিয়া রাখিও—সৃষ্টি-প্রবেণীটা বিজ্ঞের নয়, অজ্ঞের। এ'টা একটা অন্ধ-শক্তির ভৌতিক ক্রীড়া—একটা স্বপ্ন, একটা কল্পনা মাত্র।

আমি একটু স্বরে উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিলাম—তোমার ঐসব কথার মূল ভিত্তি কোথায় তাহা জান কি? বিজ্ঞ যদি অজ্ঞ হয়, আর সৃষ্টি-প্রবেণীটা যদি অন্ধ-শক্তির ক্রীড়া হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে এত ভেদ বিচার দেখা যায় কেন? সংসারটাকে দেখিয়া আমার যাহা ধারণা হয়—অন্ততঃপক্ষে জ্ঞানীরা যাহা বলেন, তাহাতে বুঝা যায়, সৃষ্টি-শক্তির একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে, ইহা অন্ধ-শক্তির ক্রীড়া নয়। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, প্রকৃতি—সৃষ্টি-শক্তি চক্ষুষ্মতী। জীবের জীবন-যাত্রার যে তারতম্য, তাহাতে দেখা যায়, ইহা কখনই অন্ধ-শক্তির ক্রীড়া বলিয়া মনে হয়না। সুন্দর সুশৃঙ্খল ন্যায়ের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমার ধারণা জন্মে। ইহাকে যদি অন্ধ-শক্তির ক্রীড়া বলিয়া বুঝাইতে চাও, সে কথাত আমি শুনিব না, তাহা মানিতেও পারিব না। শক্তিটা অন্ধ হ'তে পারে, কিন্তু তার অভ্যন্তরে পরম চক্ষুষ্মান, চির-ন্যায়বান, বিমল-প্রভ ব'লে কিছু আছে—ত?

অন্ধ-পত্নী এবং কুমারী 'থেইন্' এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। অন্ধ-পত্নী এবার বলিয়া উঠিল—এখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। সৃষ্টি-শক্তিটা অন্ধ কি চক্ষুষ্মতী, সে-বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই না; কিন্তু কর্ম্ম-নিয়ম বলিয়া একটা জিনিষ আছে যদ্দ্বারা জীব নিয়ন্ত্রিত হয়; তুমি যাহা বলিতেছ, সেটা ঐ কর্ম্ম-নিয়ম-নীতির পর্য্যায়েই পড়ে।

আমি বলিলাম—কর্ম্ম-নিয়মটা জীব-জগতের পক্ষেই খাটে, একথা স্বীকার করি; কিন্তু বীজ-নিয়মের পক্ষেও কি এই যুক্তিটা খাটে?

অন্ধ-পত্নী বলিল—তাহা খাটিবে কেন? কর্ম্ম-নিয়ম আর বীজ-নিয়ম, কথা দু'টাতেই তো প্রভেদ? তার উপরে আবার একটা ধর্ম্ম-নিয়মও আছে। বীজ-নিয়ম উদ্ভিদ-জগতের পক্ষে সত্য; আর কর্ম্ম-নিয়ম প্রাণি-জগতের পক্ষেই সত্য; ধর্ম্ম-নিয়মটী সব নিয়মের উপরেই খাটে।

চীনা-পত্নী বলিল—বীজ-নিয়মের উপরে তো ঋতু-নিয়মের ও ক্ষেত্র-ভেদ-রীতির প্রভাব দেখা যায়। সব ঋতুতে সব বীজ ফলপ্রসূ হয় না। সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববীজের উদ্ভবও সম্ভব নয়।

কুমারী 'থেইন্' হঠাৎ বলিয়া উঠিল—ছেলে দু'টীকে তোমরা নীচে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছ, ঘুম ভেঙ্গে যদি কাঁদে?

চীনা-পত্নী বলিল—তুই বোন্ একবার গিয়ে ছেলেদের দেখে আয় না। ছেলে-পুলেদের স্নেহ-যত্ন করাটা শিখে নে, সংসারে অনেক কাজে লাগিবে।

অন্ধ-পত্নী বলিল—আগে পরের ছেলের উপর মায়া-মমতা, স্নেহ-যত্ন করা শিক্ষা কর্, নিজের ছেলে হইলে তখন আর নূতন করিয়া শিখিতে হইবে না। একথা বলিয়াই সে তাহার মৃণাল-ভুজদ্বয় ধরিয়া নাড়া দিল।

কুমারী 'থেইন্' নীচে নামিয়া গেল। যাইবার সময় সলজ্জ-রাগ-রক্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকাইল। চারিচক্ষুর মিলনে মুহূর্ত্ত পরে রাগ—অনুরাগ সঞ্জাত হইল।

আমি চীনা-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—এখনই যে একটা বীজ অপাঙ্গ-দৃষ্টিপথে উপ্ত হইয়া রাগ-পুত্রের জন্মদান করিয়া আবার-যে মুহূর্ত্ত মধ্যেই লুপ্ত হইয়া গেল, সে খবরটা তোমরা রাখ কি?

চীনা-পত্নী তৎক্ষণাই উত্তর করিল—আমি জানি, আর এই 'ম্যাক্‌শেন'ও তাহা জানে এবং বুঝে। এটা আমাদের দেশে অনেকেই জানে। মূল কথাটা হইল—"চক্ষু রূপেন সংবাসা রাগ-পুত্তং বিজায়তি।"—চক্ষুর সহিত রূপের সংঘর্ষ হইলে আসক্তিরূপ-পুত্র জাত (বা ফল প্রসূত) হয়।

কুমারী 'থেইন্' শিশু দুইটীকে দেখিতে গিয়া কি করিয়াছিল জানি না, দুইটী শিশুই একসঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। উভয়েই তখন অপারিতপক্ষে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

সেদিন আমি আর কোন দিকে না গিয়া বাড়ীতেই বসিয়া রহিলাম। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' তাঁহার স্বামী, ছেলে দুইটী, কুমারী-'ফোয়াসী' এবং তাঁহার মাসিমা 'ড-নিন্' খুব সুন্দর সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলাম।

তাঁহারা সকলেই উপবেশন করিলে শ্রীমতী 'ফোয়াশেন'এর স্বামী 'মংভাসি' প্রথমেই হাসিয়া বলিলেন—মাষ্টার মশায়, আপনি 'জেয়াট্‌জী' গ্রামটী কেমন দেখিলেন? জায়গাটা মনোরম তো?

আমি বলিলাম—হাঁ, বেশ জায়গা।

সেখানে মাসিমা, মেসোমশায় আমাকে যেরূপ স্নেহ যত্ন করিয়াছেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আর আমার দিদি—তিনি যেন করুণারই প্রতিমূর্ত্তি, অত্যন্ত কোমলস্বভাবা, স্নেহপরায়ণা। ভাল কথা, দিদি আমাকে সেখানে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, মেসো-মশায় এবং মাসিমার ইচ্ছা, আপনার আর চাকরি করিবার দরকার নাই। তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট বিষয়-আসয় আছে,

সেসব দেখিয়া শুনিয়া ঐখানে বসিয়া মোড়লগিরি করিলে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইবে, কষ্ট করিতে হইবে না।

তিনি একটু যেন অহমিকার সুরেই বলিলেন—আমি শহুরে ছেলে, পাড়াগাঁ আমার ভাল লাগে না। আর ছেলে দুইটী আছে, সেখানে থাকিলে তাহাদের শিক্ষারও সুব্যবস্থা করা যাইবে না। সেখানে গ্রাম্য পাঠশালা আছে বটে; যদিও সেটা দেশীয় ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়, সে পড়া আজকাল কোন কাজে লাগিবে না। ইংরেজী না শিখিলে কাজকর্ম্ম পাইবার কোন উপায় নাই।

আমি বলিলাম—সে সম্বন্ধেও তাঁহারা ভাবিয়াছেন। ছেলে দুইটীকে এখানে ছাত্রাবাসে রাখিয়া আপনারা চলিয়া যাইতে পারেন, তাহাতে আপনার সঙ্কল্পিত শিক্ষার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না।

তিনি বলিলেন—আমার বড় আদুরে ছেলে। ওদেরকে কাছ-ছাড়া করিয়া রাখিতেও মন চায় না।—বিশেষতঃ তাহাদের মা হয়ত বেশী কাতরা হইবেন।

এ কথায় শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' বলিলেন—আমি স্নেহ করি সত্য, কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য সেটা বেশ বুঝি, কর্ত্তব্যের অনুরোধে ছেলেদেরকে ছাড়িয়া থাকিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমি সেটা ভাবিতেছ কেন? শিক্ষার জন্য ছেলেদেরকে যে রকম আমি শাসন করি, তুমি কি সে-রকম পার? ছেলেদেরকে শাসন করিলে তুমিইতো আসিয়া ঝগড়া বাধাও। যদি তুমি ছেলেদেরকে চোখের অন্তরালে রাখিয়া স্থির থাকিতে পার, তা'হলেই হইল; আমার কথা আর ভাবিতে হইবে না।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' যে কথা কয়টী উচ্চারণ করিলেন, সেই কথাগুলি দাম্পত্য-ধর্ম্মের সোহাগে এবং ভঙ্গিমায় ভরা। 'মংভাসি' আর কোন

কথা না বলিয়া চুপ করিয়াই রহিলেন। 'ড-নিন্' চুপ করিয়া বসিয়া মালা জপিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম— 'ড-নিন্'! আপনি যে একেবারে চুপচাপ।

'ড-নিন্' বলিলেন—আমার উপোসথের মালা-জপ কিছু বাকী ছিল তাই অমি নিজের মনে মালা-জপ করিতেছিলাম।

আমি বলিলাম—আচ্ছা 'ড-নিন্'! সন্ধ্যা, আহ্নিক, গায়ত্রী-জপ ইত্যাদির মতো আপনাদের কি কি আছে?

তিনি বলিলেন—মাসে আমাদের চারিটী উপোসথ,—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লাষ্টমী ও কৃষ্ণাষ্টমী; মাসে এই চারিদিন উপোসথ পালন করি, তার উপর কোন কোন সময় বেশীও করি।

আমি বলিলাম—উপোসথ অর্থে কি উপবাস-করা বুঝায়?

তিনি বলিলেন—ঠিক সে রকম বটে, কিন্তু এর একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা হ'ল—শীল, চরিত্ররক্ষা এবং মন সংযম।

আমি বলিলাম—তাহা কিরূপ বলুন।

তিনি বলিলেন—আমি পালি-ভাষা জানি না; কিন্তু আমাদের ভাষায় যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই আমি পড়িয়াছি। আর গুরুদেবের মুখেও ধর্ম্ম শ্রবণ করি। আমাদের শীল পালনের বিশেষত্ব হ'লো, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল—এই তিনভাগে শীলকে প্রথমতঃ ভাগ করিয়া নেওয়া। পঞ্চশীল বলিলে সর্ব্বশ্রেণীর গৃহস্থদের অবশ্য প্রতিপাল্য শিক্ষাপদ বুঝায়। তাহা এই:—

(১) প্রাণিহত্যা বিরতি, (২) অদত্তাদান বা চুরি বিরতি, (৩) কাম-মিথ্যাচার বা ব্যভিচার বিরতি, (৪) মৃষাবাদ বা বা মিথ্যা-কথন বিরতি, (৫) প্রমত্ততার কারণ সুরা-মৈরেয় ইত্যাদি মাদক-দ্রব্য সেবন বিরতি।

গৃহস্থগণকে এই পাঁচটী শীল বা সংযম-শিক্ষাকে কটি-বস্ত্র ধারণ করার ন্যায় নিত্য প্রতিপালন করিতে হয়। তারপর বৈরাগ্য-জিনিষটাকে অভ্যাস করিবার জন্য, সাময়িক বৈরাগ্য হিসাবে উপোসথের দিন অথবা যে দিন ইচ্ছা বা অবসর পাওয়া যায়, সে দিন অষ্টশীল প্রতিপালন করিতে হয়। তাহা এইরূপ :—

(১) প্রাণিহত্যা বিরতি, (২) অদত্তাদান বিরতি, (৩) অব্রহ্মচর্য্য বা সর্ব্বতোভাবে মৈথুন বিরতি (৪) মৃষাবাদ বিরতি, (৫) প্রমাদের কারণ সুরা-মৈরেয় ইত্যাদি মদ্যপান বিরতি, (৬) বিকাল ভোজন বিরতি, (৭) নৃত্যগীত-বাদিত্র-বিশুক দর্শন, মালা-গন্ধ-বিলেপন, ধারণ, মর্দ্দন, বিভূষণ বিরতি, (৮) উচ্চ শয্যাসন বিরতি।

আর দশশীল বা শ্রামণের প্রব্রজিত শীল এইরূপ :—

(১) প্রাণিহত্যা-বিরতি
(২) চৌর্য্য-বিরতি
(৩) অব্রহ্মচর্য্য-বিরতি
(৪) মিথ্যাকথন-বিরতি
(৫) প্রমাদের কারণ মদ্যপান-বিরতি
(৬) বিকাল অর্থাৎ দিবা-দ্বিপ্রহরের পর ভোজন-বিরতি
(৭) নৃত্য গীত-বাদিত্র-বিশুক দর্শন-বিরতি
(৮) মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মর্দ্দন-বিভূষণ-বিরতি
(৯) উচ্চ-শয্যা, মহাশয্যা বিরতি
(১০) স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি প্রতি-গ্রহণ বিরতি।

এই দশ শিক্ষাপদ প্রতিপালন করা, আমরা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই আমি উপোসথ-শীল পালন করি। সত্য সত্যই কোন

বিশিষ্ট-নীতি অনুসরণ করিয়া সংযম-শিক্ষা না করিলে দেহ-মনের মলিনতা দূর হয় না।

আমি বলিলাম,—তারপর

তিনি বলিলেন—মালা-জপের অনেক রকম প্রণালী আছে। যাহার পক্ষে যেটা সুবিধা, তিনি সেভাবেই মালা জপ করিতে পারেন।

সাধারণ নিয়ম হইল, ত্রি-লক্ষণ ভাবনা করা; যথা,—অনিত্য-লক্ষণ, দুঃখ-লক্ষণ, অনাত্ম-লক্ষণ; তাহাতে নির্বেদ-জ্ঞান হয়। আবার চরিত্র বা স্বভাব ভেদে ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীও আছে।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' হঠাৎ বলিয়া উঠিল—মাষ্টার ও সব বিষয় জানে, তুমি তাঁহাকে কি শিখাইবে মাসিমা?

'ড-নিন্' বলিলেন—কেউ জানে বলিয়া কি সত্য-কথা, ধর্ম্ম-কথা বলিতে নাই?

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' বলিলেন—মাষ্টার ঐসব বিষয় শুনিতে খুব উৎসুক, তুমি তাহাকে ভাল শ্রোতা পাইবে। আজ আমাদের অন্য বিষয় একটু আলাপ করিবার আছে, তুমি একটু থাম।

ধর্ম্ম-কথা শ্রবণে বাধা দান করায় আমি মনে মনে শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'-এর উপর বিরক্ত হইলাম। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' বলিতেই লাগিল—আমার বিশেষ কথা হইতেছে, তোমার বাড়ীটা বেশ সুন্দর, খুব বড়। আমাদেরকে এখানে থাকিতে দিতেই হইবে। এতে আমাদের জোড় আছে।

'ড-নিন্' তাহার কথা সমর্থন করিবার জন্য বলিলেন—এদেরকে এখানে আসিয়া থাকিতে দাও, বাবা!

আমি বলিলাম—তার কি প্রয়োজন মাসিমা! এঁরা বেশ বড় লোক। ইচ্ছা করিলে একটা মনোমত বাড়ী ভাড়া করিতে পারিবেন। আমার এখানে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিলে কি ভাল হইবে?

'মংভাসি' বলিলেন—মাষ্টার মশায়, আপনি যাহা ভাবিতেছেন, আসলে আমার অবস্থা সেরূপ নয়। আমি সামান্য বেতন ভোগ করি, খুব বড় চাকুরে নই। আপনার মতো বেশী টাকা রোজগার করিতে পারিলে ভাবনা ছিলনা।

আমি বলিলাম—সে কি কথা?

তিনি বলিলেন—আমি ষাট টাকার কেরাণী। আর আপনি দু'শ টাকার শিক্ষক; তদুপরি গৃহ-শিক্ষকতা করেন, পুস্তকাদিও রচনা করেন! আমার বিদ্যাও কম—ইংরেজী স্কুলে চতুর্থমান অবধি পড়িয়াছিলাম। তার বেশী আর অগ্রসর হইতে পারি নাই। ইংরেজী সংখ্যাগুলি লিখিয়া যাইতে পারি, আর তো কিছু জানি না। দুই চারিটা চলনসই কথা যাহা শিখিয়াছি, তাহা দিয়া অন্য লেখা পড়ার কাজ চলে না। কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া নিজের অযোগ্যতার বিষয় যখন ভাবি, তখন মনে বড়ই অনুতাপ আসে! তাই ছেলেদেরকে যাহাতে আমার মতো অনুতাপ না করিতে হয়, সে-বিষয়ে আমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি তো বেশ ইংরেজী জান। আমাদের বিবাহের আগে কথার মাঝখানে তোমাকে অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতে শুনিয়াছিলাম। এখন তোমাকে একটী ইংরেজী কথাও বলিতে শুনি না। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে আসিয়াছ বলিয়া ছাত্র হইবার জন্য নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছ না-কি?

'মংভাসি' বলিলেন—তাহা নয়, আমি আসলেই জানি না। আগে যা' মাঝে মাঝে বলিতাম, জানা-অজানা কথাগুলিই বলিতাম। সে-সব শুধু পাড়াগাঁয়ের লোকদেরকে ভুলাইবার জন্যই ছেলেবেলাকার চালবাজি।

মাঝখান থেকে আমি তাঁহাদের দাম্পত্য-কলহ থামাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—ঐসব কথা থাক্। পুরানো-কথার আলোচনা করিয়া কি লাভ হইবে?

মাসিমা তখন বলিয়া উঠিলেন—আমার অনেক মালা-জপ করিবার বাকী আছে। আমি যাই, তোমরা বোস।

তখন তাহারা সকলেই উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহাদের জলযোগের জন্য ব্যবস্থা করিতে বালক-ভৃত্যটীকে বলিয়াছিলাম। ঠিক সে সময় খাবার এবং চা প্রস্তুত করিয়া সে তাঁহাদের সাম্‌নে ধরিয়া দিল। সকলেই যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন—এসব কেন?

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'কে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিলাম—দিদি, তোমার জন্য নয়। 'ড-নিন্', 'মংভাসি', কুমারী 'ফোয়াসী' এবং ছেলেদের জন্যই যাহা কিছু আয়োজন করা হইয়াছে।

একথায় অন্যান্য সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চীনা-পত্নী আসিয়া উপস্থিত হইল। 'ড-নিন্'এর সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয় আলোচনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। সে বলিল—ছোট বয়সে উপোসথ পালন করিয়াছি! সংসার বন্ধনে বদ্ধ হওয়ার পর স্তন্যপায়ী শিশুদের জন্য আর উপোসথ পালন করিতে পারিনা, এজন্য মনে বড় দুঃখ। গৃহ-বন্ধনটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সংসার থেকে দূরে থাকিতে পারিলেই ভাল। আমার বড় ভুল হইয়া গিয়াছে।

'ড-নিন্' তাহার শ্লেষোক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন—এখন সে সব চিন্তা করিয়া কি লাভ হইবে ? শোধরাইবার তো আর উপায় নাই। এখন যে জালবদ্ধ-পক্ষীর মত হইয়া রহিয়াছ।

জলযোগের পর সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া আমি তাহাদিগকে আগাইয়া দিয়া আসিলাম।

চীনা-পত্নী আবার আসিয়া আমার পাশে বসিল। তাহার সেই এক কথা। 'আজ আমার বড় ঘুম পেয়েছে, পরে সে-বিষয়ে আলোচনা করিব' বলিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিলাম।

* * * * *

সংসারে নানারূপ ঘটনা-বিপর্য্যয়ে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে, সঙ্কোচনে-প্রসারণে অনেক সময় কাটিয়া গেল। চীনা-পত্নী অনেক সময় আমাকে কুমারী 'থেইন'এর আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার মনে যে ধাঁধা লাগিয়াছিল, তাহা অপসৃত করিতে সে পারে নাই।

এদিকে যেন জোর করিয়াই শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' আসিয়া আমার বাড়ীর অর্দ্ধেক জুড়িয়া বসিয়াছে। তাঁহাদের ইষ্ট-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত বহুলোকের আগমনে গৃহটী আমার মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' দিদির-দাবী করিয়া মুরুব্বী সাজিয়া তাঁহার ভগিনীদের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা করিতেছিলেন। কুমারী 'ফোয়াসী'র চাল-চলন ভাব-ভঙ্গিতে দুইদিনেই আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং শীঘ্রই সরিয়া পড়িবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' কিন্তু কোন মতেই তাহাকে যাইতে দিবেন না। সে একদিন লজ্জা-সরম ত্যাগ করিয়া বলিয়াই ফেলিল যে, তাহার প্রণয়ীর জন্য ভাবিতে ভাবিতে এখানে তাহার চোখে ঘুমও আসে না, ভোজনেও রুচি নাই।

এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' তাহাকে' বলিলেন—তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।

কাহারও কথা না মানিয়া সত্য সত্যই সে একদিন তাহার মাতা বেড়াইতে আসিলে সে-সঙ্গে চলিয়া গেল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ইহার কিছুদিন পর কোন এক মোকদ্দমার সাক্ষী দেওয়া উপলক্ষে শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'এর পিতা বৃদ্ধ মোড়ল কাছারিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দুই তিন দিন আমার এখানে বাস করিলেন। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' তাঁহার পিতার দ্বারা, 'তাহার মাতা যেন কুমারী 'টেন্‌ঞ্রুন্'কে সঙ্গে করিয়া শীঘ্রই আসেন'—সে-সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

এতদিন এক রকম ভালই ছিলাম। এ যেন একটা নূতন আব্‌দার-উপদ্রবের সম্মুখীন হইতে চলিলাম। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'এর মৃদু-মধুর স্নেহপূর্ণ কথা এবং ব্যবহারের অন্তরালে যে অভিসন্ধি এবং স্বার্থপরতা লুক্কায়িত ছিল, তাহা আমি কোনদিন ভাবিতেই পারি নাই। পাত্রী-হিসাবে শিক্ষায়, দীক্ষায়, দেহবর্ণে কুমারী 'থেইন্' যে তাঁহার অন্যান্য ভগ্নীদের অপেক্ষা উত্তম, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি আমাকে নানাভাবে নানাদিক্ দিয়া গ্রাম্য-ভাবাপন্ন করিবার জন্যই অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সব সময় একথাও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে, আমি তোমার দিদি, তোমার ভাল দেখাটাই আমার ধর্ম্ম। নগরের কাক-ধর্ম্মীদের কথা বিশ্বাস করিওনা, তাহাদের মোহে মুগ্ধ হইওনা; সরল সোজা গ্রাম্য-জীবনটাই পরম শান্তিপ্রদ।

এসব বিষয় নানাভাবে, নানাদিক্ দিয়া তাঁহার মাতার সাম্‌নে কুমারী 'টেন্‌ঞ্রুন্'কে বসাইয়া আমাকে তিনি বুঝাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু চুপ করিয়া সব কথা শুনিয়া যাওয়া ছাড়া সম্মতি-অসম্মতি কিছুই জ্ঞাপন করি

নাই এবং তাঁহার ভগিনী যে-কয়দিন ছিল, সে কয়দিন আপন বাড়ীতেও অতিথিভাবে দিন কাটাইয়াছি। তাঁহার মাতার ঘর-সংসার আছে। তাঁহারা দুইজনে এখানে থাকিলে বাড়ীতে যে বৃদ্ধের কষ্ট হইবে, সেই অজুহাত দেখাইয়া শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্'এর মাতা চতুর্থদিনের দিন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে ত্রিরত্ন-বন্দনা, মালাজপ করা, উপোসথ পালনের আলোচনা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা করিতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সংসার-ধর্ম্মে তিনি অত্যন্ত বীতস্পৃহার ভাব দেখাইতেন। এই ভাবটা তাঁহার প্রত্যেক আচরণে প্রকাশ পাইত। এইজন্য আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলাম। তিনি যাওয়ার দিন তাঁহার কন্যাকে বলিলেন—তোর যদি প্রয়োজন থাকে, 'টেন্‌এ্ন্'কে তোর কাছে রাখিয়া দে।

শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' বলিলেন—মা! কুমারী 'টেন্‌এ্ন্'কে আমি রাখিতে পারি, কিন্তু তোমাদের যে কষ্ট হইবে। পরে তাহাকে দিতেই বা যাইবে কে? তুমি তাহাকে সঙ্গেই নিয়া যাও।

বৃদ্ধা কুমারী 'টেন্‌এ্ন্'কে লইয়া চলিয়া গেলে শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' আমাকে বলিলেন—তোমাদের কিই-বা মত, কিই-বা পথ তা'তো বুঝি না। তোমাকে যে বিষণ্ণ দেখাইতেছে, সেজন্য আমি অন্তরে ব্যথা অনুভব করি। ভাই, একটা উপকথা আছে—

দুইটী পাখী একটী ফলবন্ত বৃক্ষের ডালে বসিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী পাখী মনের সুখে ফল ভোজন করিতে লাগিল। আর একটী পাখী বিবেকের প্ররোচনায় শুধু ভাবিতে লাগিল, রসাল খাইবে কি-না! খাওয়াটা ভাল, নাকি বিচার করাটা ভাল; ভোগে তৃপ্তি আছে, কি ত্যাগে শান্তি আছে; ফলের উৎপত্তি কোথায়, তার স্থিতিশীলতাই বা কি, আর পরিণতিই বা কি? ইত্যাকার ভাবিতে ভাবিতে একদিন সেই পাকা

ফলটী—যেটাকে সে এতদিন সাম্‌নে নিয়া ভাবিয়াছে, সন্দেহ দোলায় দুলিয়াছে, ভোগ না-করিয়া কেবল বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কাল কাটাইয়াছে, সেই ফলটীই বৃক্ষ হইতে মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া গেল। তখন পাখীটির চমক ভাঙ্গিল। সে বুঝিল এবং তাহা পরিভোগের জন্য লালায়িত হইল; কিন্তু তখন আর সেটা পাইবার উপায় ছিল না। তখন সে 'কেন ভোগ করি নাই' বলিয়া অনুশোচনা করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু আর রসাল ফল পাওয়া গেল না। তারজন্য সে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনুশোচনা এবং ভোগাশক্তি নিয়া জীবনটী কাটাইয়া দিল।

আমি তাঁহার এই সূক্ষ্ম কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া বলিলাম—দিদি, বিচার বুদ্ধি যখন মনের মধ্যে আসে এবং মোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন তাহাকে থামানো যায় না।

তিনি বলিলেন—যে সময়ের যে বস্তু, সেই সময়ের সেই বস্তুটাকে পরিভোগ করিয়া তাহার ভাল-মন্দ বিচার করিতে হয়। ফুলটী যে ফোটে, তাহার সমস্ত সম্পদ নিয়া আত্মদান করে—পরের চিত্ত বিনোদনের জন্য; সেইজন্য সে অচিরে মলিন ও বিলীন হয়। কিন্তু যাঁহারা কুশলী তাঁহারা যথা সময়ে সেই দান গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন, তাহাতে নিজেও ধন্য হন, ফুলকেও ধন্য করেন।

আমি তাঁহার এই কথায় মৃদুহাস্য করিয়া একটা ভারী নিঃশ্বাস মোচন করিলাম। তিনি আমার ভাব বুঝিয়া বলিলেন—ভাই বৃথা ভাবিয়া কাজ নাই।

আমি সরলভাবে হাসিয়া বলিলাম—আজ এই সব আলোচনা থাক্। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করিও না।

তিনি আসন্ন-প্রসবা বিধায় পা দু'খানা ছড়াইয়া বসিয়া বলিলেন—কি কথা ভাই?

আমি বলিলাম—তুমি আগে বল, আমাকে অকপটে সব সত্য কথা বলিবে?

তিনি বিনাড়ম্বরে বলিলেন—যাহা আমি জানি, তাহা সত্য করিয়াই বলিব, কিছুই গোপন করিব না।

আমি সাহস পাইয়া বলিলাম—আচ্ছা দিদি, 'মং-ভাসি' কি মান্দ্রাজী?

তিনি বলিলেন—তাঁহার পিতা মান্দ্রাজী ছিলেন, মাতা এদেশীয়। তিনি লৌহ-বর্ত্ম-কার্য্যালয়ে পঞ্চাশ, ষাট টাকার মত পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা ভাই বোন্ তিন জন। তাঁহার পিতা বহুকাল পূর্ব্বে কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার উচ্চ শিক্ষালাভ হয় নাই। পিতৃ-দেশের সঙ্গে বা পিতৃভাষার সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয় নাই, পিতার ধর্ম্মের সঙ্গেও তদ্রূপ।

তিনি মাতার-ধর্ম্ম, মাতৃ-আদব-কায়দা, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদি সমস্তই অকুণ্ঠিতচিত্তে—একান্ত আপনভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ছোট ভগিনীর একজন বর্ম্মার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, কোন কারণে আবার তাহার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। আর ইনিও ইহার পূর্ব্বে এই শহরের একটা বর্ম্মার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ করায় তাহাকে পরিত্যাগ করেন। তারপর কিছুদিন এদিক সেদিক ঘুরিয়া হাকিমের সঙ্গে প্রায় সময় আমাদের গ্রামে যাইতেন। তখন তিনি পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকার কেরাণী। আমি আমার মাতা-পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া তাঁহারা আমাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

আমার পিতা প্রতিপত্তিশালী, গ্রামের মোড়ল। কাজেই গ্রামের সাধারণ যুবকেরা আমার কাছে ঘেঁসিতে ভয় পাইত। ভিন্ন গ্রামের কোন শিক্ষিত যুবকও আসিতে পারিত না। হাকিম এক একবার এই গ্রাম ও চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিদর্শনে আসিলে পাঁচ, সাত, দশ দিন পর্য্যন্ত এখানে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে ইঁহাকেও থাকিতে হইত। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সঙ্গে আমার ভাব হয়, পত্র আদান প্রদান চলে। মাতা-পিতা সেকথা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন এবং আমাকে তিরস্কারও করিলেন। তারপর আমি তাঁহাকে এই সমস্ত ঘটনা চিঠি লিখিয়া জানাই। তিনি কিছুদিন ছুটি নিয়া এই গ্রামের আশে পাশে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে মাতাপিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। আমি আকাশ পাতাল অনেক ভাবিলাম। ফুলের কুঁড়ির ভিতর গন্ধ যেমন অন্ধ হইয়া বিকশিত হওয়ার আশায়—ছড়াইয়া পড়িবার তীব্র কামনায় কাঁদিয়া মরে, তেমনি আমার মধ্যেও যৌবনের বিকাশোন্মুখ কামনা-বাসনা অন্ধ হইয়াই বিকশিত হইবার জন্য গুমড়িয়া মরিতেছিল। আমি সেই দুঃখে, সেই বেদনায় অন্ধবাসনা-কামনার রোদনে অস্থির হইয়া একদিন অন্ধকার রাত্রিতে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার মতো পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। অঙ্গ-বস্ত্রমধ্যে পিতার কিছু অর্থ, অলঙ্কারপত্র লুকাইয়া লইয়াছিলাম। সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দ্রুতগামী শকটে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু মাতা-পিতার অনুশোচনা, তাঁহাদের মনঃকষ্ট আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। শহরে পৌছিয়া তিনি যখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের কাছে জোর-গলায় বেশ বড়লোক মোড়লের মেয়েকে নিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বাহাদুরি

দেখাইতে লাগিলেন, তখন আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দুঃখে, ক্ষোভে, আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি যখন আমার দেহ-ভোগের জন্য উন্মাদ হইলেন, তখন আমি আত্মহত্যা করিতে চাহিলাম। তিনি আমাকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমার মন কোন মতেই বুঝ মানিল না। বলিলাম—ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমি ভুল করিয়াছি, আমাকে ফিরিয়া যাইতে দাও।

তিনি বলিলেন—আচ্ছা, আমিই তোমাকে নিয়া যাইব।

তাহাই হইল। মাতা-পিতার কাছে আসিয়া, তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম। তাঁহারা আমার দৈহিক-পবিত্রতায় কেহই আস্থা স্থাপন করিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই চারিজন লোক ডাকিয়া, সেই দিনই ইঁহার সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—দিদি! থাক্, আর বলিতে হইবে না।

তিনি অত্যন্ত কাতরা হইয়া বলিলেন—ভাই, সারল্যের অনুপ্রেরণায়, স্নেহের টানে, ঝোঁকের মুখে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম। এই সব কথা নিয়া এখানে নাড়াচাড়া করিও না।

আমি বলিলাম—সেই ভয় তোমার করিতে হইবেনা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কখনও এই জেলার মধ্যে কাহারও কাছে আমি এই কথা প্রকাশ করিব না।

কিন্তু নারী-চিত্ত কখনই সন্দেহমুক্ত হইতে পারে না। তিনি আবার সন্দেহের সুরে বলিলেন—রহস্য-গোপনে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা ভাল—এই বিশ্বাসে তোমাকে নিজের গোপন-কথা বলিলাম।

এই বলিয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর তিনি আবার বলিলেন—

আমার অন্তর দেবতা—যিনি নিত্য সচেতন, যিনি আমার বিবেক-বুদ্ধি উদ্বোধিত করেন, তিনি সততই আমাকে কানে কানে বলেন ভাল কর নাই, ভুল-পথে চলিয়াছ, এই ভুল ইহজন্মে আর শোধ্‌রাইতে পারিবে না।

ভাবি, কতই অপরাধিনী আমি। কেন মোহের বশে, ক্ষণিক সৃষ্টি-বিকাশ-প্রবাহের আলোড়নে এতই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই ক্ষণিক উন্মাদনাকে তখন ব্যাহত করিতে পারিলেই এই মাটির দেহে আর অনুশোচনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইত না। ইহার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। সত্যকথা বলিতে কি আমার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে, তুমি সদা-জাগ্রত এবং নিয়ত বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত। তাই কথঞ্চিৎ বেদনা-ভার লাঘব করিবার জন্য তোমার কাছে আত্ম-কাহিনী প্রকাশ করিলাম—সত্য কথা খুলিয়া বলিলাম।

এই নারী যৌবনে, বিকাশ-প্রবাহকে অবাধ-গতিদান করিয়া, পরিণত বয়সে অন্তরে যে তীব্র-দহন, যে অনুশোচনা, যে যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম—দিদি, তুমি ব্যস্ত হইও না। ধর্ম্ম-চিন্তা করিয়া, সেই পথে চলিয়া বিগত-জীবনের ভুল-ভ্রান্তিকে মন হইতে বিদূরিত কর। মনে কর, আজিকার যে 'তুমি', সেই 'তুমি'র সঙ্গে অতীতের 'তুমি'র কোন সম্পর্ক নাই। বিকাশ-প্রবাহের তাড়নায় অতীতে যে বিতাড়িতা হইয়াছিল, সেই 'তুমি' আজিকার 'তুমি' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীতকে অতীতের অন্তরালে ঢাকিয়া ফেল; বর্ত্তমান জীবনটাকে সত্য, সুন্দর সুষমা-মণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর। তোমার বর্ত্তমানের কর্ম্মধারা ভবিষ্যতের গতি-পথ নির্দ্দেশ করিবে।

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া, অন্ধের হঠাৎ দৃষ্টি ফুটিলে যেমন

আনন্দে অধীর হয়, অতীতে কোন কালে সে অন্ধ ছিল, সে কথাও যেমন ভুলিয়া যায়, নূতন-দৃষ্টির আনন্দে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এবং বহুকাল-বঞ্চিত সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-দর্শনে মনকে নিয়োজিত করিয়া যেমন সে আনন্দোৎফুল্ল হয়, তাঁহার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন—ভাই, আজ তুমি আমার মহা-উপকার করিলে। অভিনব-দৃষ্টির ও অভিনব-সৃষ্টির অপার-সৌন্দর্য্যে আমাকে উদ্বোধিত করিয়া পরম মঙ্গলপন্থা নির্দ্দেশ করিলে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ঐশ্বর্য্যশালী হও, শান্তিসুখ ভোগ কর।

ইহার ঠিক দু'মিনিট পরে 'মং-ভাসি' তাঁহার কার্য্যস্থল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের আলোচনাও বন্ধ হইল।

* * * * *

একদিন শ্রীমতী 'ফোয়াশেন' তাহার ছেলেদেরকে লইয়া তাঁহার মাসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে চীনা-পত্নী ও অন্ধ-পত্নী দুইজনেই যেন পরামর্শ করিয়া আমার কাছে আসিল। দুইজনেরই ক্রোড়ে দুইটী শিশু। শ্রীমতী 'ফোয়াশেন'এর আগমনের পর হইতে ইহাদের সহিত আমার একটু দূরত্ব ঘটিয়াছিল। সেটা আমার ইচ্ছাকৃত না হইলেও তাহারা দুইজনেই সেটাকে 'অবহেলা' বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। সেজন্য চীনা-পত্নী ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—আমরা কি তোমার এখান হইতে চলিয়া যাইব?

আমি বলিলাম—কেন? তোমাদের কি অন্য কোথাও সুবিধা ঘটিয়াছে?

সে বলিল—না।

আমি বলিলাম—তবে?

সে বলিল—তোমার বোধ হয় অসুবিধা হইবে। তোমার

ঘর-সংসার বাড়িল, ভবিষ্যতে নূতন গৃহ-পত্তনে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আমাদের তখন কি গতি হইবে?

আমি বলিলাম—সে বিষয় তোমাদেরকে ভাবিতে হইবে না। যতদিন আমি এখানে আছি, ততদিন তোমরা এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। আমাকে যদি এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাদেরকেও যাইতে হইবে, তার আগে বোধ হয় নয়।

একথায় উভয়-নারীর বদন-মণ্ডল আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। অন্ধ-পত্নী স্বভাবসিদ্ধ মধুরস্বরে বলিল—জানিতাম, তুমি মহান্। আজ জানিতে পারিলাম, তুমি তাহা অপেক্ষাও সুমহান্। একটা কথা,—তুমি কি সত্যই স্থান পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর?

আমি স্বরে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম—তোমাদের কথা ভাবিলে, এস্থান ছাড়িয়া আমার কোথাও যাইবার ইচ্ছা করে না; কিন্তু যদি কোন কারণে যাইতে হয়—

সে বাধা দিয়া বলিল—যা'বার মত হ'লে যাবে বই কি! তোমার ভবিষ্যতে যদি কার্য্যের উন্নতি হয়, তোমার জীবনে সুখের, সম্মানের পথ প্রশস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, এবং সুযোগ আসিলে স্থানান্তরে যাইতে আপত্তি কি? তখন আমরাও মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনা লাভ করিব। তোমার সুখের জন্য আমাদের সুখটাকে, আমাদের শান্তিটাকে উৎসর্গ করিতেও মনে কোন ব্যথা বাজিবেনা; কিন্তু অন্য কোন কারণে যদি তোমার সান্নিধ্য ছাড়া হইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না।

আমি কোমলস্বরে বলিলাম—তোমরা নির্ভয় হও। একথা মনে রাখিও, অন্যঃ কাহারও স্বার্থ-বুদ্ধি প্রেরণায় আমি অভিভূত হইব না, নিজের কর্ত্তব্য ভুলিবনা।

উভয় নারীই তখন গম্ভীর হইয়া রহিল। তাহাদের মনের মধ্যে কি ভাব-তরঙ্গের উদয় হইতেছিল, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ ঘটিল না। বহুদিন হইতে আমার মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য ছিল—এই অন্ধ-নারীর এবং চীনা-পত্নীর পূর্ব্ব-জীবনকথা জানিয়া লইতে। কৌতূহলী মনের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য আমি তাহারা উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—তোমরা আমাকে তোমাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অকপটে মূল-কথাগুলি বলিলে, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইব। এটা আমার দাবী বলিয়া মনে করিও না--এটা আমার আবদার; আদেশ নয়—আকাঙ্ক্ষা। তারপর আরও দু'একটা বিষয় আছে—যাহা আমি তোমাদের কাছে জানিতে চাই। সে-সব পরে বলিব।

চীনা-পত্নী আনন্দের সহিত বলিল—তুমি যাহা জানিতে চাইবে, সববিষয় যথাযথভাবে তোমাকে বলিব। জীবনের ঘটনার কথা তুমি জানিতে চাও—সেটা আর বেশী কি? জীবনে যাহা সত্য, যাহা স্বাভাবিক, সেটাকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিবার সাহস আমার আছে। লজ্জা-সঙ্কোচের আঁট-ঘাট তোমার কাছে রাখিব না। সরল সোজা সত্য যাহাতে প্রকটিত হয়, তাহাই করিব।

অন্ধ-পত্নী বলিয়া উঠিল—আমার মতও তাই। অধিকন্তু জীবনটা সত্য এবং সুন্দরেরই তো অভিব্যক্তি। ইহাতে মিথ্যা ও কুৎসিত বলিয়া তো কিছু থাকিতে পারে না।

আমি বলিলাম—'ম্যাকৃশেন্'! তোমার কথায় আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। ও'র কথাটা আমি আগে শুনিয়া নিই। পরে তোমার কাছে আমার যাহা জানিবার, তাহা জানিয়া নিব।

প্রথমে চীনা-পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—তোমার মা-বাপ বাঁচিয়া আছেন ?

সে বলিল—না।

আমি বলিলাম—তোমার অন্য ভ্রাতা-ভগিনী আছে ?

সে বলিল—আমার দাদা আছেন। তিনি বিবাহ করিয়া, স্ত্রী নিয়া ঘর-সংসার করিতেছেন। পিতার সামান্য পর্ণ-কুটীরেই আমি দিন যাপন করিতাম। আমাদের দেশের অবস্থা-ত জান, মাতা-পিতা গত হইলে অন্য কেহ তেমন গ্রাহ্য করে না,—বিশেষতঃ দুর্গতদিগের কথা ভাবেও না। দাদা যখন পাড়ার আর একটী মেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়া, তাহার বাপের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন, তখন আঠার বৎসর বয়সেই আমি এক রকম আশ্রয়হীনা হইয়া পড়ি। কোথায় যাই, কে আমাকে স্থান দিবে ?—এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া 'য়ে-ডাসী' মহকুমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মাসিমার বাড়ীতে চলিয়া যাই। তাঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। মেসোমহাশয় কাঠের কারবার করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল হইতেছিল। সেই সময় মাসিমা আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া, কাজকর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য কাছে ডাকিয়া রাখিলেন। বাড়ীস্থ সকলের রান্নাবান্নার কাজ আমার মাথার উপর পড়িল। তাঁহাদের সেবা-যত্নের ভারও আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। সমস্ত দিন আমাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইত। এই চীনা ছুতার মিস্ত্রী তখন আমার মেসোমহাশয়ের বাড়ীতে কাজ করিতেছিল। তাহার সান্নিধ্যে প্রায় সমস্ত দিনই আমার কাটাইতে হইত। সে ছাড়া অন্য কোন লোকই মাসিমা [illegible] ঢুকিতে পারিত না। ঐ চীনার সঙ্গে ও [illegible] সময়ই কাছে কাছে থাকিতে হইত বলিয়া বাহিরের অন্য কোন যুবকের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গ করিবার অবসর

আমার ঘটিত না। রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ হইলে, এই চীনা-ছুতার-মিস্ত্রী যখন বাঁশের হুঁকোতে, বসিয়া বসিয়া চরস টানিত, তখন আমারও অবসর মিলিত। সে ঝিমিয়া ঝিমিয়া মাঝে মাঝে দুই চারিটী শেখা-কথায় তোতাপাখীর মতো আমার সঙ্গে আলাপ করিত। ক্রমে ক্রমে সে আমাকে ভালবাসা জানাইল। যদিও তাহার অনেক বয়স হইয়াছিল, তথাপি বহুবৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে চোখের সাম্‌নে দেখায়, স্বভাবের কোমলতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতায় ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি আমি আকৃষ্টা হইতে লাগিলাম। অনেক সময় ভাবিতাম, জীবনে যদি সুখ থাকিত, তাহা হইলে ছোট-বয়সে মাতৃ-পিতৃহারা হইতাম না। মাতৃ-পিতৃহারা হইলেও এমন দুঃখ-দৈন্যে পতিত হইতে হইত না। এই ভাবিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতাম। আমাদের জাত ভাইদের মধ্যে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক, মাঝে মাঝে আনাগোনা করিয়া, গোপনে আমার কাছে প্রেমপত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ আকৃষ্ট কেহ আমাকে করিতে পারে নাই। যাহাকে আমি অত্যধিক ভালবাসিতাম, সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া গেল। এই চীনা তাহা জানিত। তথাপি সে আমাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই। পূজারী যেমন তাহার একান্ত আরাধ্য-দেবতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তদ্রূপ এই প্রেমের পূজারীও আমার একান্তই ভক্ত, একান্তই অনুরক্ত হইয়া রহিল। প্রতি-বেশী আরও দুই তিনটী প্রায় অর্দ্ধ-বয়স্কা মেয়ে, তাহার নিকট আনা-গোনা করিত, ভুলাইবার চেষ্টাও করিত, তবুও তাহাতে সে ভোলে নাই। তাহার কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, শ্রমে ঔৎসুক্য, মিতব্যয়িতা, চিত্তের গভীরতা ইত্যাদি গুণ, ক্রমে আমার অন্তরে গভীর হইতে গভীরতর ছাপ মারিতে লাগিল।

একটি বিষয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম না। সেটা তাহার চরস খাওয়া। সে যখন সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া বিশ্রামের সময়ে চরসের ধূমপানে মত্ত থাকিত, তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক চরসের ধূমের গন্ধে, আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম। দেশে তাহার ঘর-সংসার, পত্নী-পুত্র ছিল কিনা, তাহা আমি জানিতাম না। সেজন্য কখনও তাহাকে দুঃখ করিতে বা ভাবিতেও আমি দেখি নাই। তাহার দিনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছাড়া আর যেন কিছুই নাই। দুই তিন মাস অন্তর এক একখানা চীনাভাষায় লেখা পত্র তাহার নিকট আসিত, সে নিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিয়া রাখিয়া দিত। এমন আলস্যহীন, শ্রমপরায়ণ ব্যক্তি আর কোথাও আমার চোখে পড়ে নাই। যদিও আমি তাহার ভাষা বুঝিতে পারিতাম না, তথাপি সে যখন চীনা ভাষায় মৃদু মধুর ভাবে তাহার সঙ্গীদের সহিত আলাপ করিত, তখন তাহার সেই স্বর-মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। একদিন আমি মনে মনে নিজের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। আমি যে-দেশে জন্মলাভ করিয়াছি, সে-দেশের যুবকেরা আমাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া নেয় না, কেউ সহানুভূতি দেখায় না। আমি সরল-মনে বিশ্বাস করিলে, প্রেমে মুগ্ধ হইলে, চিরতরে জীবন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহারা ঠকাইয়া চলিয়া যায়। প্রেমের মর্ম্ম তাহারা বুঝে না, আত্মসমর্পণের মর্য্যাদা রক্ষা করে না, প্রেমের দানকে শ্রদ্ধার সহিত মাথায় তুলিয়া নেয় না; অধিকন্তু ক্ষণিক-তৃষ্ণার উত্তেজনা মনে করিয়া তাহাকে অবমাননা করে, লাঞ্ছিত করে, অনাদর করে এবং পদদলিত করিয়া হাসিমুখে চলিয়া যায়। স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্যকে নরকের বীভৎস-জ্ঞানে জৈবিক-ধর্ম্মের ক্ষণিক উন্মাদনা ভাবিয়া ক্ষণিকেই

পলাইয়া যায়। চিরন্তন সত্য যেই প্রেম, সেই সত্যটাকেই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। ভাবে–এটা মোহ, ভাবে—এটা ছলনা; ভাবে-এটা মিথ্যা, তাই ছলনা করিয়াই পলায়। সত্য-দৃষ্টি, পবিত্রতা, চিরস্থিতি বিষয়ে কেউ কল্পনা করে না। আমার ধারণা—প্রেম সত্য, প্রেম পবিত্র। তাহাদের ধারণা—প্রেম মিথ্যা, প্রেম জুগুপ্সিত—ক্ষণিকের খেয়ালমাত্র। যতই আমি এই সব বিষয় মনে মনে ভাবিতাম, ততই নিজের দেশকে, এবং নিজের জাতিকে ধিক্কার না দিয়া পারিতাম না। আমি ছোট বেলা হইতেই কর্ম্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদের মতগুলি শিক্ষা করিয়াছিলাম। এটা আমাদের দেশে প্রায় সকলেই শিখে। সেই বিচার-বুদ্ধি দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম, হয়ত বা ইহা আমার একটা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল। তাহা না হইলে ইহজন্মে এত গঞ্জনা, এত লাঞ্ছনা এবং এত অবমাননাই-বা সহ্য করিতে হইবে কেন? অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসকে স্বীয়কৃত পাপকর্ম্মের ফল মনে করিয়া সান্ত্বনা পাইতাম। ভাবিতাম, সমস্তই আমার নিজেরকরা—দোষী কেউ নয়।

আমাদের দেশের নারীরা আর একটি বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা করে। তাহারা অন্তরে নারীত্বকে অত্যন্ত খাটো করিয়া দেখে। ধর্ম্মোপদেশক পুরোহিতেরা প্রায় সব সময়েই বলেন,—নারী এতই হীন–এতই নগণ্য যে, কুক্কুরের সঙ্গে তুলনায়ও তাহারা খাটো। নারী পাপ, নারীই অনর্থের মূল; নারীই তৃষ্ণার জননী, নারীই বন্ধন। সেই সব কথা দেশবাসী নর-নারী সকলেই অকপটে বিশ্বাস করে। আমিও সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসবতী ছিলাম। অনেক আশায় নিরাশ হইয়া, বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়া, মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সব সময় পুস্তক পাঠ করিতাম।

আমি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে শুধু ঐ-কথাই আছে।

নারীকে উঁচু করিয়া কেহই দেখেন নাই, কেউ দেখাবার চেষ্টাও করেন নাই। আমিও সেইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। আর একদিন কৌতূহল-বশে, অনুশোচনার তীব্র-দহনে, প্রায়শ্চিত্তের অভিপ্রায়ে, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি-বিধান খুঁজিবার জন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় হঠাৎ একটা বিষয় পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম; তাহাতে লেখা ছিল—

'গঙ্গাকে পবিত্র তীর্থজ্ঞানে, হীন-উৎকৃষ্ট-মধ্যম সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিরা স্নান করে; কিন্তু তাহাতে গঙ্গার পবিত্রতা বা তীর্থভাব নষ্ট হয় না। তদ্রূপ নারীও কামোন্মাদনায় উন্মত্তা হইলে হীন উৎকৃষ্ট-মধ্যম ইত্যাদি ভেদ-বিচার করে না। তাহাতে তাহার জাতিও যায় না।" পাঠ করিয়া সমস্ত দেহে ও মনে একটা অপূর্ব্ব শিহরণ, একটা জ্বালা, একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, নীতিকথার ছলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গল্প লিখিতে গিয়া, এমন অবিচার কি করিয়াই-বা তাঁহারা করিলেন। মনের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য আরও দুই একটি পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম। শুধু তাহা নয়, নারীকে আরও হীন করিয়া দেখানো হইয়াছে। নারী অবিশ্বাসিনী, অপরাধিনী; প্রিয়-বিচ্ছেদকারিণী। পূর্ব্ব জন্মের অশেষ অকুশলের ফলে নারীজন্ম লাভ হয়। একটা নারী জন্মলাভ করিলে নাকি, ধরিত্রী সাত হাত নীচে নাবিয়া যান, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোশল-রাণী মল্লিকাদেবী স্নানঘরে কোন্‌যুগে কি অপরাধ করিয়াছিলেন, সেকথারও উল্লেখ আছে। আমি আর পড়িতে পারিলাম না। শৈশব হইতে যে অন্তরে 'নারী' স্বভাবজাত-কুসুম, চিরপবিত্র, পরম-নির্ম্মল; দেবতা-পূজার সুপবিত্র-বেদীতেই তাহার

স্থান, কুসুমের মতো ক্ষণে-বিমলিনধর্ম্মী নয়; নারীর সৌন্দর্য্য, নারীর সদ্‌গন্ধ, নারীর প্রেম কল্পকাল-স্থায়ী। নারী সৃষ্টির পরম সম্পদ। সে-ভাব, সে-ধারণা এই সব উক্তিতে বিলীন হইয়া গেল। তবে একটা বিষয়ে আমার মনে এই সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলাম যে, অন্ততঃ শাস্ত্রকারগণ নারীকে তীর্থের সহিত উপমিত করিয়াছেন, হীন-উৎকৃষ্ট-মধ্যমের স্থানেও তীর্থভাব বা পবিত্রতা নষ্ট হয় না—একথা বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত করার অনুতাপানল এইখানেই নিবিয়া গেল। এই বলিয়া সে একটা ঢোক গিলিল।

আমি বলিলাম—তোমার মনে কি আঘাত পাইতেছ?

সে বলিল—আঘাত পাইলেও তাহা সহ্য করিয়া যাওয়াই উচিত; তাহা না করিয়া ত উপায় নাই।

আমি বলিলাম—যদি তোমার মনে কষ্ট হয়, তাহা হইলে তুমি থাম।

সে বলিল—তোমার আগ্রহ দেখিয়াই আমি বলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। যদি তোমার আগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে আমি থামিতে পারি।

আমি বলিলাম—আমার আগ্রহ আছে বটে তবুও তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই নিরস্ত হইতে বলিতেছি।

সে বলিল—আমার দুঃখ কিছু নাই। যে বোঝা এতদিন পর্য্যন্ত নিজে বহন করিয়া আসিয়াছি, যেই বেদনাভারে আমার ঘাড় অবনমিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার বোঝা যদি কতকটা হাল্‌কা করিতে পারি, তাহা হইলে মন্দ কি?

আমি বলিলাল—তোমার বেদনার-বোঝা আমি কি গ্রহণ করিতে পারিব?

সে বলিল—তুমি খুব পারিবে। তোমাকে কিছু এই বেদনার বোঝার ভার দিয়া, আমার বোঝাটা হাল্কা করিতেই হইবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তোমার বেদনা-ভার বহনের জন্য ঠিক ভারবাহী রাসভ আমাকেই তুমি বোধহয় চিনিয়া নিয়াছ।

একথায় চীনা-পত্নী ও অন্ধ-পত্নী উভয়েই খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাসি থামিলে, আমি বলিলাম—আমাকে আর উৎকণ্ঠিত রাখিলে কি হইবে? তোমার কথাটা শেষ কর।

সে বলিল—শেষ ত হয়েই গেছে। বাকী যাহা, সেটা এই ছুতার-মিস্ত্রীর সঙ্গে পরিণয়-ব্যাপার মাত্র, গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা মাত্র।

আমি বলিলাম—তাহাই-বা আর বাকী থাকে কেন?

সে বলিল—বলার উৎসাহ আর আমার বিশেষ নাই। তবে সংক্ষেপে কথাটা সারিয়া নিই! "তারপরে আরও ঠিক দুই বৎসর আমি দেহ-মনকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিয়া, নিজের মঙ্গল-বিষয়ক চিন্তা করিয়াছি। মাতৃপিতৃ-সুখ বেশীদিন ভাগ্যে ঘটে নাই। জ্যেষ্ঠ-সহোদরের সুখও মোটেই লাভ করিতে পারি নাই। এই মেসো-মাসীর গৃহে চিরজীবনটা যদি পরিচারিকার মতো কাটাইতে হয়, তাহা হইলেও জীবনটা সুখের হইবে না। যে উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তার কথা ও অন্যান্য দু'একজন যা'দের আমি ভালবাসিতাম, তা'দের কারো সঙ্গ লাভ করিবার আশা প্রাণে জাগিল। আবার ভাবিলাম—বিচার করিয়া দেখিলাম, যদি তা'দের মধ্যে কাকেও জীবন-সঙ্গী করিয়া নিই, তা'হলে তাহাদের খেয়ালের বশে, মত্ততার ঝোঁকে যে সন্তান সন্ততি জন্মলাভ করিবে, সেই সন্তান-সন্ততির হাতেও হয়ত-বা শেষ-বয়সে শান্তিতে কাটাইতে পারিব না। ভাবিলাম,

সংসারে ঢুকিয়া আর লাভ নাই। উপাসিকা সাজিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিব। সেই ইচ্ছায় বহুদিন মঠে ভিক্ষুদের এবং ঐ শ্রেণীর উপাসিকাদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করিয়াছি। বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি যেখানে বুঝিতে কষ্ট হইত, সেই সমস্ত বিষয় পণ্ডিত ভিক্ষুদের এবং উপাসিকাদের নিকট হইতে বুঝিয়া লইতাম। আমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল। যাহা পড়িতাম, তাহাই মনে থাকিত। যে-সব জটিল বিষয় আমি বুঝিতে পারিতাম না, সেগুলি বুঝাইয়া দিলে স্থিরচিত্তে, নিবিষ্টমনে তাহা গ্রহণ করিতাম। পুনরায় যেন ভুলিয়া না যাই, সেই চেষ্টায় বার বার তাহা অধ্যয়ন করিতাম এবং মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতাম। নিত্য-পঠনে পাঠ-পিপাসা আমার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অনেক গ্রন্থ পাঠ করিলাম, তাহাতে মনে অনেকটা স্থিতিভাব আসিল।

একদিন এই চীনা আমার কাছে কাঁদিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে প্রেম নিবেদন করিল। সেজন্য মাসিমা এবং মেসোমশায় উভয়েই সেইদিন রাগ করিয়া আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন, এমন কি তাঁদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেও বলিলেন। আমি সমস্ত অত্যাচার উৎপীড়ন, বাক্য-বাণ সাশ্রুনয়নে, অধোবদনে সহ্য করিলাম। তারপর সকলের ভোজন শেষ হইলে, অনাহারে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। পেটে খাদ্য নাই, চোখে নিদ্রা নাই, মনেও শান্তি নাই; দেহ অবসন্ন, মন দুর্ব্বল,—চক্ষের জলে উপাধান সিক্ত করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। চীনা ছুতার-মিস্ত্রী সব বিষয় জানিত। সকলে নিদ্রিত হইলে রাত্রি একটার সময় আসিয়া আমার ঘরের দরজার কাছে আর্ত্তস্বরে সে 'মা-কোন,' 'মা-কোন' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার কাতর-স্বর শুনিয়া আমি নিজের দুঃখ ভুলিয়া

গেলাম। দরজা অর্গলমুক্ত করিয়া দেখিলাম, সে ভূমিতে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি চাও? তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল—আমার কিছু হয় নাই। তোমার প্রতি অত্যাচারে, অবিচারে, নিপীড়নে আমি মরমে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। এস, আমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাই। আমি বলিলাম—কোথায়?

সে বলিল—আমরা টংগু শহরে যাইব। বড় শহর—আমার কাজ জুটিবে। আমরা সুখে দিন কাটাইতে পারিব। আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। সে টাকা দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে নিয়মিত ভাবে খরচ করিলে দুই চারি বৎসর চলিতে পারিব। ভাবিলাম, এর পরামর্শ মন্দ নয়। তখনই যেন অভিভূতের মত—ভূতাবিষ্টের মত নিজের সামান্য যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা লইয়া এই চীনা ছুতার-মিস্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি ৩টা-২০ মিনিটের সময় মাসিমার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। তখন মন্দালয় হইতে রেঙ্গুন গামী 'টংগু'র দিকে যাইবার একখানা গাড়ী ছিল, আমরা সেই গাড়ী ধরিলাম। ভোর ৫টার সময় টংগুতে পৌছিয়া শহরের চীনা-পল্লীতে গেলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যেই এক জায়গায় একটা বাড়ী ভাড়া করা হইল। সেদিন আমরা এক চীনার হোটেলে খাইয়া কাটাইলাম। ঘর-কন্নার সমস্ত সরঞ্জাম অন্যান্য চীনারা যোগাড় করিয়া দিল। বিকালবেলা ভাবিলাম, এ-ত কলের পুতুলের মতো সব করিয়া যাইতেছে, আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা হইয়াছে, আমি কি করিয়া তাহার সঙ্গে ঘর-সংসার করিব? শাস্ত্র-সম্মত লোকাচার ভাবে এখনও-ত আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই নাই। তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—কথা শোন; আমাদের বিবাহের কি ব্যবস্থা হইবে? তুমি আমাকে ধর্ম্মমত গ্রহণ না করিলে ত আমি তোমার সঙ্গে সংসার করিতে পারিব না। সে আদরে

আমার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল—সে ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি। চীন-দেশের রীতি অনুসারেই আজ আমাদের বিবাহ হইবে—যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই বিযুক্ত হওয়া চলে না। সেই বিবাহ-মতেই আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব। আমি শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। রীতিমত শাস্ত্র-সম্মত ভাবে তাহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলাম।

আমি বলিলাম—আর তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না। তুমি এবার থাম।

তাহার কথা বলার সময়েই, আমাদের সকলের জন্য চা-প্রস্তুত করিবার কথা আমার বালক-ভৃত্যকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। সে যথাসময়ে সমস্ত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। 'মা-কোন্' ও 'মা-ম্যাক্‌শেন্' যেখানে বসিয়াছিল, আমিও সেখানে তাহাদের কাছে গিয়া বসিলাম, এবং চা পানের জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম। প্রচুর জলযোগের সহিত চা-পান করা হইল। আমার মনে মনে অন্ধ-পত্নী 'ম্যাক্‌শেন'এর জীবন-কথাটা শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু সেদিন আর সময় ছিল না। যে কোন মুহূর্তেই শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল।

* * * * * *

কোন্‌দিকে?—এদিকে না ওদিকে? নগরে কি গ্রামে?

বিবেক-বুদ্ধি অন্তরের মধ্য হইতে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কোনদিকে নয়। এদিকেও নয়, সেদিকেও নয়; গ্রামেও না, নগরেও না। কিন্তু ঘটনা-বিপর্য্যয়ে, নানাকারণে শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' আমার উপর এত প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, তাঁহার কথার

একটুও বাহিরে যাইবার আমার উপায় রহিল না। তিনি যেন মহা-সংগ্রামের জন্য আঁট-ঘাট বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমাকে রক্ষা করা—একেবারে তাঁহার হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা, এইটাই যেন তাঁহার পরম উদ্দেশ্য, চরম লক্ষ্য হইল। তাঁহার গর্ভকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, যে কোনদিন সন্তান প্রসূত হইতে পারে। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক যা' কার্য্য, তৎসমস্তই সম্পাদনে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। তিনি আমাকে একদিন বলিলেন—এই ছেলে মানুষটা কি ভাল রান্না করিতে পারিবে? আমিই রান্না করিব। ছেলেটা বাজার-করা, জল-তোলা, কাঠ আনিয়া দেওয়া, লঙ্কা-মসলা পিষিয়া-দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজই করুক। এক বাড়ীতে ভাই-বোনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রান্না করিয়া, দুইহাতের দুইপাতে খাওয়া ভাল দেখায় কি?

আমি একটু সমস্যায় পড়িলাম। ঘানি হইতে ১৮৷৷০টাকা মূল্যের আমি একটিন খাঁটি সর্ষপ-তৈল আনাইয়া রাখিয়াছিলাম। ২২৲ টাকা মূল্যের একবস্তা 'সাবিনা' চাউলও আনাইয়াছিলাম। আর ডাল, আলু, লঙ্কা' মসলা, হলুদ, ময়দা, আটা, ঘি, সুজি, চিনি ইত্যাদি সামগ্রীও প্রচুর পরিমানে মজুত রাখিতাম। দৈনিক কাঁচা বাজার যাহা করিতে হইত, তাহাতে মৎস্য, মাংস তরি-তরকারী, ফল-মূল ছাড়া অন্য কিছু নয়। আলোর খরচ তাঁহাদের ছিল না। আমার আলোতেই তাঁহাদের কাজ চলিত। তাঁহারা নিজের শোবার ঘরে কখনও আলো জ্বালিতেন না। তাঁহাদের রন্ধনের জন্য সর্ষপ-তৈল প্রথম দুই তিন দিন ছাড়া আর কিনেন নাই। জ্বালানী-কাষ্ঠ কখনও তাঁহাদের কিনিতে হয় নাই। এভাবে ভ্রাতৃত্বের-স্নেহের-অত্যাচারে তিনি আমাকে

আপ্যায়িত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামী বুক ফুলাইয়া বলিতেন, আমাদের খরচ এবার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ বাড়ীভাড়া তাঁহারা কপর্দ্দকও দিতেন না; দিবেন বলিয়া কোন রকমের আভাসও কোনদিন পাই নাই। কুমারী 'থেইন্'কে দেখিতে পাইলেই নানাভাবে বিদ্রূপাত্মক কথা তাঁহারা আমাকে বলিতেন। তাঁহাদের অন্যান্য আত্মীয়দের দ্বারাও সে সব কথা আমাকে বলাইতেন। তাঁহার প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এই অছিলায় কিছুদিন কাজকর্ম্ম করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার খুড়তুত-ভগিনী কুমারী 'ফ্যু' অথবা মাস্তুত-ভগিনী কুমারী 'টেন্এ্রুন'কে শীঘ্রই আনাইবার প্রস্তাব ঘন ঘন আমার সঙ্গে ও তাঁহার স্বামীর সঙ্গে করিতে লাগিলেন। এই সব কারণে বিতৃষ্ণায় আমার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ক্ষুদ্রাশয়তার যন্ত্রণায় ও ঘনিষ্টতার দাবীর উৎপীড়নে আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। চীনা-পত্নী এবং অন্ধ-পত্নীর প্রতিও কটাক্ষ করার কসুর তিনি করিতেন না। তাঁহার স্বামীও লেপাফাদুরস্ত-ভেজাবিড়াল গোছের লোক। চীনা-পত্নী ও অন্ধ-পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলে আমি মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইতাম। কি করিব ভাবিতেছিলাম।

ছুটির দিন শুইয়া শুইয়া দুপুরবেলা পুস্তক পাঠ করিতে করিতে দুইটার সময় আমার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ঠিক্ তিনটা। সম্মুখ ভাগে মস্ত একখানি দর্পণ রাখিয়া নিরিবিলিতে রান্নাঘরের পাশে প্রসাধন গৃহে দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াই কুমারী 'টেন্এ্রুন' তখন খোঁপা বাঁধা ও প্রসাধন কার্য্যে-ব্যাপৃতা ছিল; অর্থাৎ মুখ হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে সে

'সানাখা' মাখিতেছিল। হঠাৎ এসময় আমাকে দেখিতে পাইলে সে লজ্জা পাইবে, এইভয়ে আবক্ষ সুষ্ঠুরূপে আবৃত না করা পর্য্যন্ত আমি আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার বালক-ভৃত্যটি কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল। মুখ ধুইবার জন্য রান্নাঘরের পাশে না গিয়া উপায় নাই। ঘরের দরজা ভিতর হইতেই অর্গল বদ্ধ করিয়া শ্রীমতী 'ফোয়াশেন্' তাঁহার সন্তানটিকে লইয়া নিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন। কুমারী 'টেন্‌গ্রুন' বসন সংযত করিলে আমি সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। সে তূলি দিয়া ভ্রূর উপরিস্থ শ্বেতবর্ণের অঙ্গরাগ মুছিয়া ফেলিবার জন্য তূলিটাকে মুখে দিয়া লালাসিক্ত করিয়া দুই ভ্রূর উপরে সযত্নে টানিয়া দিল।

শ্বেতবর্ণের মাঝখানে যেন ভ্রমর-কৃষ্ণ-ধনুক শোভা পাইতে লাগিল। আমার হৃদয়ে একটু কবিত্ব-রসের সঞ্চার হইল কিন্তু সযত্নে সেই রস-প্রবাহকে ব্যাহত করিয়া দু'পা অগ্রসর হইলাম। প্রশস্ত-দর্পণে তাহার মুখচ্ছবির সঙ্গে আমার মুখমণ্ডল দর্পণবক্ষে—বোধ হয় তাহার বক্ষেও প্রতিফলিত হইল। কুমারীসুলভ শালীনতার ঘোরে ক্ষণেকের তরে চমকিয়া উঠিয়াই সে মুকুরে আমার স্মিতাননের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অপাঙ্গকোণে হাস্যরেখা ফুটাইয়া তুলিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কুমারী পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। কুমারী 'থেইন্'এর ন্যায় ইহার বর্ণ দুধে-আল্‌তার মত না হইলেও স্বাস্থ্যসম্পদে নিটোল-দেহ বড় সুন্দর, অত্যন্ত মনো-মুগ্ধকর। আজ টের পাইলাম, স্বাস্থ্য শুধু সুখের মূল নয়, সৌন্দর্য্যের মূলও বটে।

দর্পণ হইতে অন্যদিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া সে আমাকে বলিল—আপনার কি কিছু দরকার আছে?

আমি বলিলাম হাঁ।

সে বলিল—কি ?

আমি বলিলাম—আমার মুখ ধুইবার জল চাই।

সে বলিল—আমি আনিয়া দিব কি ?

আমি বলিলাম—থাক্ তোমার কষ্ট করিতে হইবেনা, আমি নিজে গিয়াই মুখ ধুইব।

মুখ ধুইয়া আসিয়া কিসের ঘোরে জানি না, হঠাৎ আমি বলিয়া ফেলিলাম—ভগিনি টেন্‌এন্! তুমি বড় সোন্দর, মনোমুগ্ধকর।

সে দর্পণ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—মিছে কথা, তুমিই সোন্দর, অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, তোমার রূপ মনোহর।

আমি বলিলাম—এ-টা তোমার সুজনতা।

সে বলিল—তা' নয়, ইহা সত্যবাদিতা।

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—ও কি বলিতেছ? তা' কি কখনও হয়? জগতে যেখানে সেখানে নারী-সৌন্দর্য্যেরই বর্ণনা হ'চ্ছে, নারী-সৌন্দর্য্যেরই প্রতিকৃতি নানাভাবে সারাজগতে পরিব্যাপ্ত। তাহার বর্ণনায় কবি মুখর, ভাবুক, উন্মত্ত; সৌন্দর্য্যের উপাসকগণ আসক্ত। তোমরাই সৌন্দর্য্যের রাণী।

সে বলিল—তাহা আমি জানি। তোমাকে মিছে কথা বলিতে হইবে না। তোমরাই সৌন্দর্য্যের রাজা।

আমি বলিলাম—তোমার পক্ষে ক্ষণিকের তরে তা' সত্য বলে মনে হ'তে পারে।

সে বলিল—না, এটা সর্ব্ববাদীসম্মত চিরন্তন সত্য।

আমি বলিলাম—কি রকম ?

সে বলিল—জীবজগতে স্ত্রী ও পুংভেদে দুই শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়,

প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই পুংজাতি স্বভাবসুন্দর। স্ত্রী জাতি কুৎসিত, অন্ধকার—কালো, বীভৎস, রুক্ষ—

আমি হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলাম—বেশ হয়েছে, একটু থামো।

সে বলিল—থামিব কেন? পুরুষ সত্যই সুন্দর, আলো, শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম। নারী অন্ধ; তার অন্ধত্ব ঘোরঘনাবৃত কুৎসিত। পুরুষ বাস্তবিকই যে স্বভাবসুন্দর।

আমি হাসিয়া বলিলাম—এটা কি তোমার নিজের কথা বলিতেছ?

সে বলিল—হাঁ, আমার প্রাণের কথা।

আমি বলিলাম—তুমি কি করিয়া তা জান?

সে বলিল—আমার মাসিমা ও মেসোমহাশয়ের গুরুদেব এই উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন—নারীজাতি স্বভাব-কুৎসিত। সেজন্য তাহাদিগকে অঙ্গরাগ করিয়া, সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া, অলঙ্কার পরিয়া, ফুল গুঁজিয়া, বিলেপন মাখিয়া করালমূর্ত্তি ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু পুরুষদের তা' প্রয়োজন হয় না। তিনি আরও বলেন—ষাঁড় এবং গাভীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, মোরগ ও মুরগীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, ময়ূর ও ময়ূরীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, হংস ও হংসীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, কপোত ও কপোতী[র] সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ, এমন কি করাল-বদনা কালী মূর্ত্তির সঙ্গে [মহা]দেবের তুলনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমন আরও কত আছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পুংজাতি স্বভাবসুন্দর।

আমি বলিলাম—সে কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?

সে বলিল—চোখের সাম্‌নে এতগুলি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বিশ্বাস না করিয়া কি উপায় আছে?

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমার চোখে কিন্তু তোমাদের মত নারী-দেরকেই সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

সে সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে বলিল—নারীদের চক্ষে পুরুষদেরকেই অধিকতর সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

আমি বলিলাম—তাহার মূলে একটা গূঢ় রহস্য আছে। নারী যখন পুরুষকে সুন্দর দেখে, পুরুষের সঙ্গ কামনায় লালায়িতা হয়, তখন সে নারী থাকে না—নারীত্বের ভাবে মুগ্ধা হইয়া পুরুষকে কামনা করে না; অধিকন্তু নারীর মনে যখন পুংভাব প্রবল হয়, তখন সে তাহার সমধর্ম্মী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পুরুষকে সুন্দর দেখে, তাহার সঙ্গ-লাভের জন্য লালায়িতা হয়। সেই সময়ের জন্য তাহার নারীত্ব লুপ্ত হইয়া যায়—সুপ্ত হইয়া পড়ে।

সে প্রসাধন শেষে উঠিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—পুরুষের বেলাও তবে তাই। পুরুষের যখন মনোমধ্যে নারীত্বের ভাব ফুটিয়া উঠে; সেই ভাব প্রবল হয়, তখন সেও নারীকে সুন্দর দেখে, তাহার সঙ্গ কামনা করে, মিলনাশায় ছুটিয়া মরে, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া আরও কত রকম অপকার্য্যও করে।

আমি তাহার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম—তুমি কি একথাও তোমার মেসোমহাশয়দের গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছ ?

সে অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিল—আরও অনেক দেশবিখ্যাত ধর্ম্ম-কথিক স্থবির, মহাস্থবির মহোদয়গণের নিকটও শুনিয়াছি।

আমি সলজ্জ সহাস্যবদনে নম্রভাবে বলিলাম—তোমাকে আমি যত নির্ব্বোধ, যত নিরক্ষরা ও পাড়াগেঁয়ে বলিয়া মনে করিতাম, তুমি তা' নও, তুমি তার বহু উচ্চে।

সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিল—আমাদের জ্ঞান ধার করা,

সিঞ্চন করা, পদ্মপত্রের জলবিন্দুবৎ। যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ তাহা বিদ্যমান থাকে, একটু নড়িলেই পড়িয়া যায়। তোমাদের জ্ঞান ধীর, স্থির, স্থায়ী ও অচঞ্চল

আমি বলিলাম—উভয়েই সমান। আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান অবস্থা।

হঠাৎ আমার পিছন হইতে চীনা-পত্নী বলিয়া উঠিল—তোমরা বেশ ভাল বিষয় নিয়াই আলোচনা করিতেছ!

আমি চীনা-পত্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—নারী যে স্বভাবসুন্দর, তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যরাশি দিয়াই যে পুরুষকে বিকশিত করে—ফুটাইয়া তোলে, একথা কি মিথ্যা, দিদি? বীজ তার কুৎসিত ক্ষুদ্ররূপকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিলীন করিয়া—বিলীন করিয়া, লুক্কায়িত রাখিয়া, সুন্দর পত্রপুঞ্জ-ফল-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের সৃষ্টি করে। গোলাপ, কেতকী, পদ্ম—কুৎসিত সকণ্টক বৃক্ষেই যে সব ফুলের জন্মলাভ, সে সব ফুল কী সুন্দর! কেমন মনোমুগ্ধকর! কেমন সদ্‌গুণ ও সদ্‌গন্ধযুক্ত! এইখানেই নারীত্বের—মাতৃত্বের—প্রকৃতির, আত্মদানের—আত্মবিকাশের—পরপ্রকাশের মহিমা। যা' কিছু কুৎসিত, যা' কিছু অশোভন, যা' কিছু খারাপ, তৎ সমস্তই নিজের মধ্যে রাখিয়া বৃক্ষ, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত গন্ধ তজ্জাত কুসুমকে দান করে। মাতা—জননী—প্রকৃতি অন্তরের সমস্ত রূপরাশি দিয়া, সব মলিনতা নিজে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহারই সৃষ্ট, তাঁহারই কামনা, তাঁহারই উৎস হইতে উৎসারিত পুরুষকে সদ্‌গুণ, সদ্‌গন্ধ-যুক্ত ও সুষমামণ্ডিত করেন। এইখানেই তাঁহার আত্মত্যাগের মহিমা অভাবনীয়, অনুপম। আরও একটু ভাবিয়া দেখ—কমলালেবু, দাড়িম্ব, বেদানা, রসাল, দ্রাক্ষা ইত্যাদি ফল—

যাহা খাদ্য-প্রাণে গুণে গন্ধে রসে ভরপুর, সে-সবের জননী তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাটি হইতে, জল হইতে, সূর্য্যের আলোক হইতে, বায়ু হইতে এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ওজঃরস হইতে স্বীয় ফলের জন্য রূপ, রস, গন্ধ, খাদ্যপ্রাণ, উপকারিতা, রোগাপহরণের ক্ষমতা, পুষ্টিসাধনের উপকরণ সমস্তই সংগ্রহ করিয়া লয়। সেজন্য যে তাহাকে অত্যধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কুমারী 'থেইন্' আসিয়া কিছুক্ষণ হইতে চীনা-পত্নীর অন্তরালে আড়ষ্টভাবে বসিয়া আমাদের কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। সে হঠাৎ মৃদুস্বরে বলিল—দিদি! তোমরা বৃক্ষ ও ফল-ফুলের কথা বলিলে, আমি সব শুনিয়াছি; কিন্তু একটা কথা বাদ দিয়ে গেলে কেন?

আমার স্বভাব-উৎসুকপ্রাণে ঔৎসুক্য জাগিল। সেজন্য তাহাকে আমি বলিলাম—কি কথা বোন্!

সে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল—চন্দন বৃক্ষের ফলও নাই, ফুলও নাই, অথচ নিজে সদ্‌গুণ ও সদ্‌গন্ধটাকে চিরকাল একান্ত নিজেরভাবেই ধরিয়া রাখে, অন্য কিছুতে ফুটাইয়া তোলে না—বিকশিত করে না। ইক্ষু নিজের রসে নিজেই ভরপুর, তারও ফলও নাই, ফুলও নাই।

আমি তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। বুঝিলাম, ঐ অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশির অভ্যন্তরে গভীর দৃষ্টিও আছে।

চীনা-পত্নী সংক্ষেপে তাহার কথার উত্তর দিয়া বলিল—ও সবেতে মাতৃত্বের বিকাশ নাই বলিয়াই—বন্ধ্যা বলিয়াই এই ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে। 'মা-ম্যাক্‌শেন্' এসব বিষয় খুব ভাল জানে; আমি তাহাকে ডাকিয়া আনি, তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

আমি বলিলাম—তুমিও কারুর চাইতে কম জান না, দিদি!

সে বলিল—ভাই, 'মা-ম্যাক্‌শেন'এর যে দান, তাহা অপার, অসীম; তাহার জ্ঞানও গভীর, তাহাকে আমি ডাকিয়া নিয়া আসি।

আমি বলিলাম—তাহাকে কষ্ট দিয়া এখানে তুলিয়া নিয়া আসিবার দরকার নাই। আমি নিজেই তাহার কাছে যাইব। এই বলিয়া নীচে নাবিয়া গেলাম।

কুমারী 'থেইন' আমার আগেই নাবিয়া গিয়া 'ম্যাক্‌শেন্'এর শায়িত শিশুটির পাশে বসিয়া শিশুটিকে আদর করিতেছিল। অন্ধ-পত্নীকে উপলক্ষ করিয়া আমি বলিলাম—তোমার শরীর আজকাল কেমন আছে?

সে বলিল—বেশ ভালই আছে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার শিশুটি কেমন আছে?

সে বলিল—তোমরা সকলের আশীর্ব্বাদে—মৈত্রী-চিন্তার প্রভাবে ভালই আছে। আর আমার নিজের দেহের কথা ভাবিবার দরকার কি? আমার সন্তানটি ভাল থাকিলেই হইল।

কুমারী 'থেইন্' মৃদুস্বরে বলিল—সন্তান-সন্ততি হইলে আর বুঝি নিজের দেহের প্রতি, নিজের সুখের প্রতি কোন দৃষ্টি থাকে না?

অন্ধ-পত্নী বলিল—জনয়িত্রীর কর্ত্তব্য ত ঐখানেই শেষ। সন্তানের বাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। সেই-ত তাহার সর্ব্বস্ব, সেই-ত তাহার অন্তরের অন্তরতম রূপ, হৃদয়ের নিগূঢ়তম কামনা। তার বাড়া আর কি হইতে পারে?

কুমারী 'থেইন্' আঙ্গুল দ্বারা অন্ধ-পত্নীর উরুতে দু'টী খোঁচা

দিয়া কানে কানে কি একটি কথা বলিল। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি তীক্ষ্ণ। সে হঠাৎ সেকথায় হাসিয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিতেছি।

কুমারী 'থেইন্' বামহস্তখানি দিয়া তাহার ঠোঁট দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খবরদার! কোন কথা বলিও না।

অন্ধ-পত্নী তাহার হাতখানি মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া মৃদুহাস্যে বলিল—তোমার কোন লজ্জা নাই। এ-টা কিছু অপরাধের কথা নয়, ভাল কথাই-ত তুমি বলিতেছ! তা' তোমরা নিমন্ত্রণ খাইবে বৈকি! তাঁহার যদি বিবাহ হয়, তোমরা সকলের আগেই আসিবে, সকলের আগেই খাইবে, এবং সকলের আগেই আনন্দ উপভোগ করিবে। তাহাতে দোষের কি আছে?

আমি বুঝিলাম, কুমারী 'টেন্‌গুন' আমার বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করায়, ইহাদের ধারণা কিরূপ হইয়াছে।

অন্ধ-পত্নী একটা ঢোক গিলিয়া, একটু সঙ্কোচ করিয়া আবার বলিল—গুরুমহাশয়! তোমাদের কি পাকাপাকি কথা হইয়াছে?

আমি বলিলাম—কিসের কথা?

সে বলিল—বিবাহের কথা।

আমি বলিলাম—কার সঙ্গে?

সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কিন্তু ভাই, আমার এই বোন্‌টীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইলে, আমরা খুব খুসী হইতাম।

আমি বলিলাম—বিবাহের অভিপ্রায় আমার মোটেই নাই। তবে, তোমাদের যদি প্রকৃতই আনন্দ বর্দ্ধন হয়, এবং তোমরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া, আমার রুচি বুঝিয়া, আমার প্রাণের স্পন্দনের পরিচয় পাইয়া, সে রকম সঙ্গিনী যদি ঠিক মত চিনিয়া থাক,

তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে তোমাদের সন্তোষ বিধানের জন্য, তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য, আমি তাহাতে সম্মত হইতে পারি। একথা বলিয়াই, আমি একবার ত্বরিদ্দৃষ্টিতে কুমারী 'থেইন্'এর দিকে তাকাইলাম। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আনন্দ-জোয়ার উথলিয়া উঠিতে-ছিল। অন্ধ-পত্নী বামবাহু দ্বারা তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার আরক্তিম-গণ্ডে একটা টোকা মারিল।

আমি চলিয়া যাইতেছি এমন সময় বাড়ীর ফটকদ্বারে দেখিলাম, অন্ধ কোথা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে। আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,— মং-ম্যাক্ক্যা' ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?

সে বলিল—হাকিমের বাড়ীতে। তাঁহার কাকাবাবুর অজীর্ণরোগের জন্য আমাকে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম—তুমি কবিরাজীও কর নাকি ?

সে বলিল—দেহযন্ত্রের শিরা-উপশিরাগুলি চিনিয়া নিতে পারিলে এবং তাহাতে রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারিলেই সব রকমের অসুখ সারিয়া যায়। বাহ্য ঔষধপত্রের কোন প্রয়োজন করে না। তাহার পাকাশয়ের যে সমস্ত নাড়ীভুঁড়ির দোষে পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদন হয় না, সে সমস্ত ঠিক করিয়া দিতে পারিলেই অসুখ সারিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম—তবে ত দেখিতেছি, তুমি বেশ ওস্তাদ লোক !

সে বলিল—আমি ঐ কর্ম্ম করিয়াই-ত খাই। নিজের বিদ্যা যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে কি কাজ চলে ? আপনার অসুখের সময় আমি যে কি করিয়া সারাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা কি আপনার মনে নাই ?

আমি বলিলাম—বেশ মনে আছে। সেকথা থাক্, বড় বাড়ীতে গিয়াছ, রোজগার কি হইল—সে কথা বল শুনি।

সে ট্যাঁক হইতে দু'টি টাকা বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—এই দেখুন না, দুই টাকা নিয়া আসিয়াছি। আবার রাত্রে যাইব, কাল দুই টাকা নিয়া আসিব।

আমি বলিলাম—তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ী গিয়া তোমার টাকা রাখিয়া দাওগে।

সে বলিল—আপনিও আসুন, কিছুক্ষণ বসুন। বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নাই, একটু আলাপ-সালাপ করি।

চীনা-পত্নী একটি পাটি পাতিয়া দিয়া আমাকে বলিল—এইখানে এসে বসো ভাই!

অন্ধ তাহার পত্নীর হস্তে টাকা দু'টি দিয়া বলিল-টাকাগুলি রাখিয়া দাও।

আমি কৌতূহলী হইয়া বলিলাম—কিছু মনে করিও না! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমরা দুইজনেই অন্ধ; তোমাদের সংসারে কি-রকম লাগে? তোমরা কি পরস্পরকে খুব ভালবাস?

সে বলিল—আমাদের এই ভালবাসার তুলনা নাই।

আমি বলিলাম—তোমরা দু'জনের মধ্যে পূর্ব্ব-রাগের সঞ্চার হইয়াছিল কি করিয়া?

সে বলিল—দাম্পত্য-ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই আমরা অক্ষয় ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্ব-রাগ বলিয়া আমাদের কিছু ছিল না। কারণ আমরা বাহিরে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাই না, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে উভয়েই উভয়কে দেখিতে পাই। তাহাতেই আমাদের প্রেম এত নিবিড়, এমনই সুদৃঢ় যে, আমাদের এই বন্ধন কেহ ছেদন

করিতে পারিবে না। কারণ, আমরা প্রেম-স্বপ্নে বিভোর, আমরা বাহিরের বাস্তবের ধার ধারি না; স্বপ্নের যেই সুখ, সেই সুখ নিতান্ত একারই, অত্যন্ত আপন। ইহার ভাগ কেহ পায় না। ইহা অত্যন্ত মধুর এবং একান্তই আপন অনুভূতি-গোচর।

আমি বলিলাম—এ স্বপ্ন কি তোমাদের ভাঙ্গিবে না? আমরা বলি, স্বপ্নের সুখ সুখই নয়—ইহা ভ্রমমাত্র, কল্পনামাত্র, প্রহেলিকামাত্র।

অন্ধ দৃঢ়স্বরে বলিল—স্বপ্ন যদি আমার এতই মধুর হয়, তাহা হইলে জাগরণের কল্পনাটাই ভুল, সেটা মিথ্যা। আমি জাগিতে চাই না। কেহ যদি আমাকে জাগরণের বার্ত্তা দেয়, তাহাকেও আমি পছন্দ করি না। আমরা স্বপ্নরাজ্যের জীব, স্বপ্নটাই আমাদের সত্য। জাগরণের কল্পনাটাই ভুল, সে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। আমরা মায়াবদ্ধ জীব, মায়ার অধীন, মায়াই সর্ব্বস্ব, স্বপ্নই সত্য, কল্পনাই সত্য। আর কিছু আমরা বুঝি না, বুঝিবার অধিকারও আমাদের নাই। যাহা আমাদের বুঝিবার অধিকার নাই, প্রকৃতপক্ষে সে-বার্ত্তা যদি কেহ দেয়, তাহা হইলে সেইটাই আমাদের কাছে ভুল বলে মনে হয়। যে বলে আমরা অন্ধ, তাহাকে আমরা মনে করি, সে বিকারগ্রস্ত—অসুস্থ—পীড়িত—অপ্রকৃতিস্থ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি ইংরাজী ভাষায় এক গল্প পড়িয়াছিলাম। তোমার কথা শুনিয়া সে-কথাটা মনে পড়িতেছে।

চীনা-পত্নী এবং অন্ধ-পত্নী দুইজনেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে আমাকে বলিল—তোমার সেই গল্পের কথাটা আমাদিগকে বল, আমরা শুনিব।

আমি বলিতে লাগিলাম—"চতুর্দ্দিক পাহাড়-ঘেরা সুজলা সুফলা এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিল। সেই দেশের উদ্দেশে একদল

লোক যাত্রা করিল। দলের বহুলোক বরফের পাহাড় অতিক্রম করিতে গিয়া পথে পথে মরিয়া গেল। অনেক কষ্টেস্বষ্টে কয়েকজন মাত্র লোক সেই দেশে গিয়া পৌঁছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, শস্য-সম্পদে পূর্ণ ছিল বলিয়া সে-দেশে তাহারা স্থায়ীভাবে বাস করিতে সঙ্কল্প করিল। দৈবক্রমে তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন লোক অন্ধ হইয়া গেল এবং সেই অন্ধত্ব ক্রমান্বয়ে সংক্রামক ব্যাধির মত সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িল। অনেকটা বাইবেলোক্ত প্লেগের মত—যেন ভগবানের অভিশাপ তাহাদের উপর পতিত হইল। কিন্তু সেজন্য তাহাদের কাহারও মধ্যে দুঃখ ছিল না, এবং তাহাদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কোন অসুবিধাও ঘটিল না। কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন-ধারণোপযোগী নানা বৃত্তি-ব্যাবসা অন্ধেরা নির্ব্বিঘ্নে বিনাকষ্টে সম্পাদন করিত।

আমেরিকার মত সৌখীনদেশের একদল উৎসুক লোকের কানে এই খবর গেল। তাঁহারা মনে করিলেন, সেই অন্ধের দেশে গিয়া আধিপত্য করিবেন। সে উদ্দেশ্যে যাত্রার পথে, পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিতে গিয়া পথে পথে অনেক লোক মরিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের সঙ্কল্প দৃঢ়, তাঁহারা মৃত্যুভয়ে ভীত নন। অসীম উদ্যমে তাঁহারা এই অনির্দ্দেশ যাত্রার পথে চলিয়াছেন। আর একটিমাত্র বরফের পাহাড় অতিক্রম করিতে পারিলেই তাঁহাদের অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছা যায়। হঠাৎ বরফের পাহাড ভাঙ্গিয়া তাঁহারা সকলেই গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'নুনেস' নামক একজন লোক বরফের পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া অন্ধ-দেশ পার্শ্বে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। আর সবের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

অন্ধরাজ্যের লোকেরা 'নুনেস্'কে লইয়া গিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। সে সুস্থ হইয়া মনে করিল—"প্রকৃতির লীলা-নিকেতন ভূস্বর্গে আসিয়া আমি পৌঁছিয়াছি। এখানে অন্ধদের উপর রাজা হইব। তাহারা আমার দৃষ্টিশক্তির মূল্য বুঝিতে পারিবে। আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া বশীভূত হইবে।" যে সদাশয় ব্যক্তির গৃহে 'নুনেস্' আশ্রয় লাভ করিয়াছিল. তাঁহার বাড়ীতে 'মদিনা' নামে এক কুমারী কন্যা ছিল। 'নুনেস্' তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। ক্রমে তাহাদের মধ্যে যখন প্রণয় সঞ্চার হইল, তখন 'নুনেস্' তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করে। কিন্তু কুমারী 'মদিনা' তাহার মাতাপিতাকে সব কথা বলিয়া দেয়। তখন কুমারীর মাতাপিতা তাহাতে সম্মত হইয়া, তাঁহাদের দেশের রীত্যনুসারে কুমারীর বিবাহ দিতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের ডাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্দ্দার, তিনি বলিলেন—'নুনেস্'এর সঙ্গে কুমারী 'মদিনা'র বিবাহ দিতে হইলে, আগে তাহাকে নীরোগ করিতে হইবে। তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইবে। সে উন্মাদ; তাহার মস্ত বড় রোগ আছে। তাহাকে যথাযথ চিকিৎসা করিয়া পরে কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে।

'নুনেস' সে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহারা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—তাহার চক্ষু দুইটি তুলিয়া না ফেলিলে এই রোগ সারিবে না। ঐ চোখ দু'টাই তাহার প্রধান রোগ।

'নুনেস' মদিনার সৌন্দর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার দৃষ্টিশক্তির বিনিময়েও কুমারী 'মদিনা'কে বিবাহ করিতে সম্মতিজ্ঞাপন করিল। সেইদিন হইতে সপ্তম দিবসে তাহার অস্ত্র-চিকিৎসার দিন ধার্য্য করা

হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিকিৎসকের কাছে গিয়া তাহার চক্ষু দুইটীকে উৎপাটিত করিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। ইহাদের যেই কথা সেই কাজ। কোন কথা বা কার্য্য একটুও নড়চড় হওয়ার যো নাই। ইহার পূর্ব্বে সে একবার অন্ধদের দ্বারা ধৃত হইয়া শাস্তিভোগ করিয়াছিল। এই সম্মতিদানের পর সে যদি ইহার অন্যথা করে, তাহা হইলে তাহার যে কঠোরতর শাস্তি হইবে—এমন কি প্রাণদণ্ড হইবে, ইহাও 'নুনেস্' নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল। 'মদিনা'র কাছে গিয়া তাহার রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, প্রেম নিবেদন করিয়া, সে চির-অন্ধত্বের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তারপর তাহার মনের মধ্যে কল্পনা আসিল, যেই দৃষ্টিশক্তির বলে আমি 'মদিনা'র রূপে মুগ্ধ হইয়াছি, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছি, সেই সম্পদ থেকে কি করিয়া চিরতরে বঞ্চিত হইব? এই দৃষ্টিশক্তি হারাইলে 'মদিনা'র রূপরাশি-ত আমাকে আর মুগ্ধ করিতে পারিবে না! তাহার প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকিবে না! আমার দৃষ্টিই-ত তাহার রূপের মূল্য বুঝিতে পারে! আসল জিনিষ হারাইয়া তাহার দেহশোভা এবং বিশ্বশোভা উপভোগ করা হইতে আমি বঞ্চিত হইব। মদিনা! প্রেয়সি আমার! রূপসি আমার! আমার নয়নানন্দদায়িনি সৌন্দর্য্যরাণি! তুমি আমার সঙ্গে পলাইয়া যাইবে না? তোমার ধর্ম্ম, তোমার সমাজ, তোমার দেশ, তুমি ত্যাগ করিবেনা? আমি দেশ ত্যাগ করিয়াছি, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি, সমাজ ত্যাগ করিয়াছি; আমার যে একমাত্র সম্বল, এই দৃষ্টি-শক্তিটাকেও ত্যাগ করিবার জন্য তুমি আমাকে জোর করিতেছ। আমার আর অন্য কোন সম্বল নাই। না, তাহা হইবে না—এই দৃষ্টিকে আমি বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। এই মনে করিয়া নির্দ্দিষ্টদিনের

পূর্ব্বরাত্রিতেই রাত্রির অন্ধকারে সে চুপি চুপি মদিনার ঘুমন্ত মুখ-মণ্ডলের সৌন্দর্য্য দর্শনান্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রিতেই সে গৃহত্যাগ করিল। সে চক্ষুষ্মান বলিয়া তাহার পক্ষে দিবারাত্রি, আলো-অন্ধকার দুইটীর প্রভেদ ছিল। কিন্তু অন্ধদের পক্ষে আলো-অন্ধকার দুই-ই সমান। তাহাদের কোন তফাৎ নাই, রাত্রি দিনের ভেদাভেদ নাই। 'মদিনা'র পিতা জাগিয়া উঠিয়া, 'নুনেস্' পলাইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, লোকজন ডাকিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। 'নুনেস্' দৃষ্টিশক্তি হারাইবার ভয়ে প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল। বরফের পাহাড় অতিক্রম করিতে গিয়া হঠাৎ পর্ব্বত-শিখর হইতে একখণ্ড বরফ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে-ও সেই-সঙ্গে গড়াইয়া পুনরায় অন্ধদেশে আসিয়া পড়িল। কিন্তু পড়ার সময়েও সযত্নে প্রাণের বিনিময়েও চক্ষু দুইটীকে উন্মীলিত করিয়া রাখিয়া দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত হইতে না দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে চক্ষু খুলিয়াই জীবন বিসর্জ্জন দিল।"

সময় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সংক্ষেপে—চুম্বকে, আমি অন্ধ-দেশের গল্পটী তাহাদিগকে শুনাইলাম। উদ্দেশ্য—তাহাদের ঠিক প্রাণের কথাটী খোঁচাইয়া বাহির করা। বৃদ্ধ-চীনা কখন যে আসিয়া একান্তে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করিতেছিল, তাহা আমি টের পাই নাই। আজ এই অন্ধের ভবনে—সম্ভবতঃ অন্ধরাজ্যে নিজেকে অন্ধ জ্ঞান না করিয়া—দৃষ্টিহীন মনে না করিয়া, মায়াবদ্ধ মনে না করিয়া, বাদ পড়িবার কোন উপায় ছিল না। কুমারী 'থেইন্' আমার সংক্ষিপ্ত গল্পে—বোধ হয় তার সৌন্দর্য্যেও যে অত্যন্ত আকৃষ্টা হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই রহিল না।

অন্ধ-পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিলাম—'মা ম্যাক্‌শেন্‌'! এই সব বিষয়ে তোমার অভিমত কি?

সে বলিল—ইহার মূলে যে আমি। আমি যাহাকে শক্তি দেই, যাহাকে দৃষ্টি দেই, যাহাকে ফুটাইয়া তুলি, যাহাকে বিকশিত করি, সে-ই শক্তি পায়, দৃষ্টি পায়, ফুটিয়া উঠে—বিকশিত হয়।

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ-টি তোমার অহমিকার কথা, দিদি!

সে আঙ্গুল দিয়া স্বীয় বক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—মোটেই না, গুরু-মহাশয়! ইহাই আমার সত্যস্বরূপ। তুমি কি কখনও কালীমূর্ত্তি দেখিয়াছ? তাহার বীভৎস রূপ, করাল বদন, ভুজ চতুষ্টয়ে সৃষ্টি-বিধ্বংসী প্রহরণ, পদতলে মহাদেবের পতন,—

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া, বাধা দানের ছলে যেন তাচ্ছিল্যভরেই বলিলাম—তুমি যে অন্ধ, তোমার কি বাহিরের রূপ দেখিবার দৃষ্টি আছে?

সে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—ক্ষণিক রূপের ছায়াপাত করার জন্য জীবের ইন্দ্রিয়পথে যে আবরণী আছে, তাহা আদাস—দর্পণ বিশেষ। তাকে দৃষ্টিশক্তি বলা হইলেও সেই দৃষ্টি সত্যদর্শনে অপারগ—অক্ষম। মাত্র সেই ইন্দ্রিয় পথ-দর্পণের অধিকারী হইয়াই তুমি আমাকে অন্ধ বলিতেছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহা তোমার ভুল কি না। এ-যে আমার অন্তরের রূপ, এ-যে আমার স্বপ্ন-সৃষ্ট দিব্যমূর্ত্তি; আমি দেখিতে পাইব না কেন? তুমি নাকি বিদ্যার তেজারতি কর, জ্ঞান দান করিয়া বেড়াও, দৃষ্টিশক্তি দাও? তুমি এ-সত্যকথাটা বুঝিতে পার না? সত্যই কি কেহ অন্ধ হইতে পারে? বাহিরে দৃষ্টিহীনের ভাণ করিলেও অন্তরে সে দৃষ্টিসম্পন্ন। এই দৃষ্টিহীনতা মায়ার খোলস, কামনার খেয়াল, তৃষ্ণার আবরণমাত্র।

ছেলেমেয়েদের 'কানামাছি-ভোঁ-ভোঁ' খেলা তুমি কি কখনও দেখ নাই? যে কানামাছি সাজে, তাহার চোখ বাঁধিয়া দিতে হয়, বাহিরের দৃষ্টিটাকে খেলার ছলে ব্যাহত করিতে হয়। কিন্তু তাহার চারিধারে অন্য ছেলেমেয়েরা বেষ্টন করিয়া 'কানামাছি-'ভোঁ-ভোঁ' করিয়া ছুটাছুটি করে। সে তাহাদেরকে ধরিবার চেষ্টা করে, অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়। দৈবচক্রে হঠাৎ দলের কাহাকেও ধরিতে পারিলে, তাহার চোখের আবরণ মুক্ত হইয়া যায়, সেই আবরণ যাহাকে ধরে তাহার চোখেই পড়ে, নিজের বন্ধন খুলিয়া যায়। আর একথাও ভাবিয়া দেখ, আমি যদি সত্যই অন্ধ হইতাম, তাহা হইলে চক্ষুষ্মানের জন্মদান করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হইত? আমি ত আত্মজকে অন্ধ করি নাই, চক্ষুষ্মান করিয়াই ফুটাইয়া তুলিয়াছি। সে কামনাও যে আমরা করিতে পারি না। সৃষ্টি-প্রবেণীর সহায়তার জন্য শুধু তাহার জনককেই আমি বহির্দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিয়াছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ওগো, মায়া! ওগো, মোহ! ওগো, তৃষ্ণার জননি! আসক্তির উৎপাদিকা! তোমার ছলনায়, তোমার মায়ায়, তোমার স্বপ্ন-রঙে রঙিন-রাজ্যের দিগন্ত-বিভ্রান্তচ্ছটায় আমি উদ্ভ্রান্ত না হইয়া-ত পারি না। তোমার এই মায়া, এই মোহ, এই খেলার কি অন্ত নাই? কোনদিন কি কেউ তোমার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না?

সে বলিল—তুমি ভাবিতেছ কি? আমি অত স্বার্থপর নই। আমি মুক্তি দেই, দৃষ্টি দেই, আমি সৃষ্টি করি। তা' না হইলে যুগে-যুগে, কল্পে-কল্পে সম্যক্ সম্বুদ্ধের মত জ্ঞানী, সে-রকম ভববন্ধন-মুক্ত মুক্তিদাতার উদ্ভব কি সম্ভব হইত? আমার এই বক্ষ হইতে,

আমারই রস-রক্তে, আমারই সহায়তায় মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। যাঁহারা সত্যই আমার বন্ধন ছাড়িতে চান, যাঁহারা একনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মায়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, বীততৃষ্ণ, বীতরাগ, তাঁহাদের বন্ধন, তাঁহাদের মায়ার আবরণ, তৃষ্ণার জটা ছিন্ন করার পথে আমি বাধা সৃষ্টি করি না, বরং সহায়তা করি। তাঁহাদের খোলস যখন খসিয়া যায়, জটা যখন ছিন্ন হয়, তখন তাঁহারা অন্ধ-জননীর দোষ-কীর্ত্তন করেন, অন্ধত্বের নিন্দা করিয়া বেড়ান। তাহাতে আমি একটুও রাগ করি না। কল্পে কল্পে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, মহাদেব যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি জগদ্‌গুরুগণ মুক্তি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ সমস্ত মহাপুরুষগণ ছাড়া আরও কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জীব তোমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞাত-অজ্ঞাত, খ্যাত—অখ্যাত, ভব-বন্ধন-মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। সেজন্য কি আমার দুঃখ আছে? আমার অনন্ত অক্ষয় শক্তি-উৎসের খেলা কি বন্ধ হইয়াছে? আমার আদি-অন্ত কি কেহ খুঁজিয়া পাইবে? আমি নিজে অপরিসীম উজ্জ্বল আলো উৎসারিত করিয়া, সেইদিকে তাকাইয়া আনন্দিত হই। তার তীব্রচ্ছটায় মাংসচক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়, বহির্দৃষ্টি লুপ্ত হয়—সুপ্ত হয় বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অব্যাহতই থাকে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—যাঁহারা নিজে মুক্ত হইয়া পরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার একটু কুৎসা করিয়া গিয়াছেন।

সে অট্টহাস্য করিয়া বলিল—ওসব কথা আমার গায়ে লাগে না। আমার অনন্ত, অপরিসীম সৃষ্টি-প্রবাহ মধ্য হইতে কিছু জীব যদি বাহির হইয়াও যায়, অসীম আকাশে উড়িয়াও গিয়া থাকে, অনন্ত শূন্যে উঠিয়া, যদি আমার নিন্দাও করিয়া থাকে, তাহাতে আমার

ক্ষতি কি? এটাও মনে রাখিও, অনন্ত অপরিমেয় জলধিবক্ষ হইতে যদি কোটি কোটি বারিবিন্দু বাষ্প হইয়া উঠিয়া যায়, তাহাতে কি তার পূর্ণতার কিছু অঙ্গহানি হয়? ইহাতে সত্য সত্যই মহাসমুদ্রের ঊনত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

আমি এবার কাতরভাবে বলিলাম—ওগো মায়াময়ি! দয়াময়ি! তোমার এই খেলা কি সাঙ্গ হইবে না?

সে কোমলস্বরে বলিল—আমার সৃষ্টি-স্থিতি ব্যাপারের মূলে অনন্ত সংগ্রাম, অসীম উন্মাদনা, ধ্বংসামোদের তাণ্ডব নর্ত্তন সব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। আমার সৃষ্টির প্রত্যেক অণু-পরমাণু ধ্বংসের জন্য—বিনাশের জন্য পরমানন্দে নৃত্য করে, একে অন্যকে গ্রাস করিয়া বাঁচিতে চায়। ক্ষণিক তারা বাঁচেও, কেউ কেউ দীর্ঘকালও বাঁচে। খেলিতে খেলিতে যখন আমার অবসাদ আসে, তখন আমি মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করি। যাহাকে তোমরা 'ভবাগ্র' বল, সেখানে কিছুকাল—কয়েক কল্প আমি বিশ্রাম লাভ করি। আবার খেলা আরম্ভ হয়। এর ক্ষণিক বিরতি আছে বটে, কিন্তু একেবারে নিবৃত্তি বা বিধ্বংস নাই।

আমি কাঁদ কাঁদস্বরে বলিলাম—বহুকাল আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি, কামনার—বাসনার অনলে ইন্ধন যোগাইয়া অন্তরে বাহিরে তীব্র হোমানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছি। এই মহা-অগ্নিকুণ্ডের নিবৃত্তি চাই। আমার এই আগুনের কি নির্ব্বাণ হইবে না, দয়াময়ি! এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্রিয়া কি বন্ধ করিতে পারিব না? মুক্তি কি আমার অধিগত হইবে না?

সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—এত উতলা হইতেছ কেন? সৃষ্টির শৃঙ্খল যখন আমার হাতে আছে, সমগ্র জীবকে যখন আমি একই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তখন আমার ইচ্ছার যতদিন না নিবৃত্তি

হইবে, ততদিন কি এই শৃঙ্খলের সুদৃঢ় বন্ধন কেউ খুলিতে পারিবে? আমি নিজেই যখন তোমাদের সাথে শৃঙ্খলিতা, শুধু তোমাদেরকে কি আমি খুলিয়া দিতে পারি?

আমি হাতযোড় করিয়া বলিলাম—তুমি কি আমায় দয়া করিবে না?

সে যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াই বলিল—আমি কে, আর তুমিই বা কে? তোমাতে আর আমাতে কি ভেদ আছে? আমি-ই যে তুমি, আর তুমি-ই যে আমি! আত্মরূপই যে বিশ্বরূপ!

অন্ধের এই অন্তর্দৃষ্টির তীব্র শুভ্র নির্ম্মল জ্যোতিঃ—আলো-প্রভা আমার তমসাবৃত অন্তরে উজ্জ্বল রশ্মিসম্পাতে অভিনব দৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া, অনন্ত অসীম নভোমণ্ডলে বিচিত্র লীলায় ও সুচিত্র-বরণে ফুটিয়া উঠিল। দেদীপ্যমান মহা ব্যোমের ন্যায় সেই রূপ দর্শনে, আলোর নর্ত্তনে, সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের অন্তস্থলও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সেই আলোকের তড়িচ্ছটায় দেখিতে পাইলাম, সেই অন্ধ-নারীতেই দশ মহাবিদ্যার স্ফুরণ—তাহারই তীব্র জ্যোতিঃর বিকীরণ। ত্বরিতেই বুঝিতে পারিলাম, অবিদ্যাই বিদ্যার জননী, অজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎপাদিকা—প্রজ্ঞার অভিভাবিকা, তাহারই সহায়িকা। সেই নির্ম্মল আলোকের তীব্রচ্ছটার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া আমার বহির্দৃষ্টি লুপ্ত—সুপ্ত—পরাভূত হইল। ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, সেই বিলীয়মান তীব্র শুভ্র-আলোক-স্নাতা প্রকৃতিদেবী পুরুষ-দেবতার হাত ধরিয়া কামনা-মোদ-রুদ্ধ নয়নে, ত্রিভঙ্গিম চরণে, অর্দ্ধনর—অর্দ্ধনারীরূপে ধরাতলে যেন নামিয়া আসিতেছেন। ধীরে ধীরে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ শূন্যে মিলাইয়া গেলে, এদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, শ্রীমতী চক্ষুষ্মতী পূর্ব্ববৎ অন্ধত্বের ছলনা করিয়াই তাহার ছেলেটিকে বক্ষে

তুলিয়া লইয়া—"ওলো, আমার সোনা! ওলো, আমার মাণিক! ওলো, আমার দৃষ্টি! ওলো, আমার হৃদি-রাজ্যের অনুপম সৃষ্টি"—বলিয়া আদর করিতে লাগিয়া গিয়াছে।
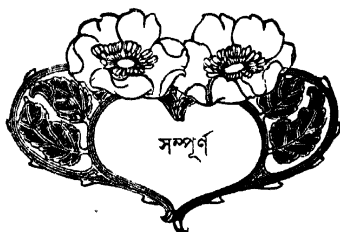
গ্রন্থোক্ত বর্ম্মা নাম গুলির বাঙ্গলা প্রতিশব্দ

মা-ম্যাক্‌শেম্—চক্ষুষ্মতী

মং-ম্যাক্‌ক্যা—পদ্মলোচন

ড-এ—শীতলিকা

মা-থেইন্—সুচিত্রা

ফোয়াশেন্—সুচরিতা

টেন্‌এ্যুন্—সুমতি

ফোয়াসী—কণিকা

ফ্যু—শুভ্রা

মা-কোন্—জালিকা

মংভাসি—বিন্দুলাল